আলোর বার্তা

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের
বেদতত্ত্ব আলোচনা ও ভাষণ সংকলন।।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

সমগ্র পরিকল্পনা, সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক ঃ-
শ্রী চপল মিত্র

সংকলনে সহযোগিতায় ঃ-
ডঃ সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় ও হেনা মিত্র

মুদ্রণে ঃ-
মেসার্স এম. দত্ত
১১, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট
কোলকাতা - ৭০০০০১.

প্রথম প্রকাশ ঃ-
শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৪
ইং ২১শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৮

প্রাপ্তিস্থান ঃ-
১) ব্রহ্মচারী ধাম সুখচর, উত্তর ২৪ পরগণা, কোলকাতা - ৭০০১১৫
Email : bbt_sukchar@yahoo.co.in
২) ২৯১ এস. কে. দেব রোড, কোলকাতা-৪৮, ফোন - ২৫২১-৫১৯৬
৩) ১৯৭, লেক টাউন, ব্লক - বি, কোলকাতা-৮৯, ফোন - ২৫২১-৫১৪৬

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত।

পূর্বাভাষ

স্রষ্টা নিজেকে প্রকাশ করছেন নব নব সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। সেই সৃষ্টিরই পরম প্রকাশ আমাদের সূর্য। সূর্যের ঔরসজাত এই জীবজগত। তিনিই অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে এসে জীবজগতকে প্রকাশ করছেন। প্রতিটি জীবের মধ্যে তাঁরই ক্ষমতা (তাপ) জাপ্য অবস্থায় চির বিরাজমান। সুতরাং প্রতিটি জীবই তেজ অর্থাৎ সূর্যের প্রতীক। আবার তাঁরই আলোকে আলোকিত পৃথিবী, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহরাজি। তাঁকে কেন্দ্র করেই পৃথিবীতে দিবারাত্র, তাঁরই আকর্ষণে জোয়ার ভাঁটা। তাঁর তেজ প্রতিটি জীবের মধ্যে যেমন বিরাজমান, তেমনি আমাদের অনন্ত পথ চলার পথে কখনও আলো, কখনও অন্ধকার, কখনও জোয়ার, আবার কখনও বা ভাঁটা। তাই রোগ, শোক, জ্বালা, ব্যথা যন্ত্রণা প্রভৃতি প্রকৃতির প্রহরীরা জীবনে চলার পথে, অনন্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে আমাদের সাথের সাথী, যুগযুগান্ত ধরে জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়ে, আবর্ত্তনে বিবর্ত্তনে পরিবর্তনের ধারায় ধারায়, সৃষ্টির ধারাপাতা ধরে ধরে, রূপে রঙে রসে গন্ধে বর্ণে পরিবর্ত্তিত হতে হতে জীবজগৎ কখনও মশা-মাছি, কখনও কীটপতঙ্গ, কখনও জন্তু-জানোয়ার, আবার কখনও বা মনুষ্যরূপে এগিয়ে চলেছে অনন্ত আলোর পথের সন্ধানে।

মৃত্যুর হাত থেকে আমরা কেহই রেহাই পাব না। আমাদের জীবনে যত বড়াই, যত অহঙ্কার, যত অভিমান, যত দম্ভিকতা থাকুক না কেন, সবটুকুই ৭০/৮০ বা ১০০ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে কোন অভিমান, দাম্ভিকতা, অহঙ্কার থাকবে না। যৌবন থাকবে না, কিছুই থাকবে না। থাকবে একমাত্র ন্যায়, নিষ্ঠা, সত্য। থাকবে একমাত্র আলো। তাই আমরা চাই আলো, চাই জ্ঞান সূর্যের আলো।

আমাদের জীবনে যখন তমসার আঁধার নেমে আসে, তখন আমরা আলোর সন্ধানে ছুটে চলি। এই জীবলোকে সকলের শরীর, মন, ইন্দ্রিয় সকল একই সুরে গাঁথা। তাই আমাদের কর্ত্তব্য মনে প্রাণে অন্তরে সেই আলোর সাধনা করে আলোর জগতে পৌঁছানোর চেষ্টা করা।

চন্দ্র তার আলোর জন্য সূর্যের উপর নির্ভরশীল, তেজের উপর নির্ভরশীল। সূর্যের সেই আলো এক কলা, দুই কলা করে করে পূর্ণিমাতে পূর্ণ হয়ে পূর্ণচন্দ্রে বিকশিত হয়। আমরাও তেজের সাথে তেজ মিলিয়ে এক কলা, দু'কলা করে করে ১৬ কলায় পূর্ণ হয়ে যেন বিকশিত হতে পারি। পূর্ণচন্দ্রের আলোক, জ্ঞান সূর্যের আলোক আমাদের মধ্যে জেগে উঠুক। অনেক কণিকা মিলেই আলোর সৃষ্টি। সেই আলো, সেই তেজ নিয়ে চন্দ্রের স্নিগ্ধ আলোকের ন্যায় জীবকুল জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হয়ে উঠুক।

অন্ধকারে ঘেরা জীবন আমাদের। প্রতি মুহূর্ত্তে অন্ধকারের জালে আমরা আবদ্ধ হয়ে আছি। হে প্রকৃতি মা, হে স্রষ্টা, হে আলোর দেবতা, হে পরমপিতা, আমরা অজ্ঞান, আমরা অবুঝ। আমাদের বুদ্ধি দাও। আমাদের বিচার বিবেচনা দাও। আমাদের মাত্রাজ্ঞান দাও। হে পরমপিতা, সূর্যের আলোকে যেমন আলোকিত চন্দ্র, তেমনই তোমার পবিত্র স্পর্শে, তোমার তত্ত্বের আলোকে, জ্ঞানের আলোকে, তোমার কৃপা, ভালবাসাও স্নেহের আলোকে আমাদের অন্তরের জ্ঞান সূর্যও আলোকিত হয়ে উঠুক, আজ এই প্রার্থনা করি তোমার শ্রীচরণ কমল যুগলে।

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ কখনো ঘরোয়া পরিবেশে, কখনও বা বিভিন্ন জনসভায় অমৃতময় বেদতত্ত্ব পরিবেশন করেছেন। তাঁরই ইচ্ছায় ও নির্দেশমত তাঁর সেই অমৃতময় বেদতত্ত্ব ছোট ছোট পুস্তিকা আকারে প্রকাশের গুরুদায়িত্ব, তাঁরই ইচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত **অভিনব দর্শন** প্রকাশনের উপর তিনি অর্পণ করেছেন। তাঁর ইচ্ছা ও নির্দেশের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা জানিয়ে, তাঁর নির্দেশকে শিরোধার্য করে **অভিনব দর্শন** প্রকাশনের অষ্টাদশ শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকাশিত হ'ল **'আলোর বার্তা'**।

পরিশেষে জানাই পরমপিতা জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের তত্ত্ব ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন শ্রী অনির্বাণ জোয়ারদার, শ্রী দেবতনু চক্রবর্ত্তী। এছাড়া যে সকল ভক্ত ও গুরুগত প্রাণ ভাইবোন আন্তরিকতার সাথে এই অমৃতময় বেদতত্ত্বের গভীরতা ও মাধুর্য আস্বাদন করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছেন, তাদের সকলকে জানাই পরম পবিত্র বৈদিক অভিনন্দন **রাম নারায়ণ রাম**।

শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৪ — *চপল মিত্র*
ইং ২১শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৮ — *(সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক)*

সহজভাবে স্বচ্ছভাবে আমি তোমাদের কোলে রেখেছি অন্তরে রেখেছি

সুখচর ধাম
১লা মার্চ, ১৯৯৩

(প্রথম অংশ)

তোমাদের নাম গান কীর্তন যেভাবে করতে বলা হয়েছে, সেরকমভাবেই চলার পথ ঠিক করবে। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে একেকরকম মতের কথা বলে, সে বিষয়ে তোমরা খেয়াল করে চলবে। আজ কত বছর হয়ে গেল, তোমাদের সাথে যে অন্তরের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, আমরা সেই সম্পর্ককেই বেশী দাম দেব। কাজ কি করতে হবে, সেটা সময়মত বলা হবে। তোমাদের ঘর আছে, বাড়ী আছে। বাবা মা আছেন, আত্মীয়-স্বজন আছেন, তাদের সাথে সুর মিলিয়ে চলতে হবে। **একটা কথা যদি বলি, সেই কথার অর্থ হয়তো একজন তোমাদের কাছে অন্যরকমভাবে বললো। তাই আমার কথা আমার কাছ থেকেই শুনবে। সত্যকথার একটাই কথা, সেখানে আর অন্য কোন কথা চলে না। যেদিন তোমাদের দীক্ষা দিয়েছি, তোমরা দীক্ষা নিয়েছ, সেইদিন থেকেই বাপ-বেটার সম্পর্ক হয়ে গেছে।**

নিজেদের মধ্যে এমন কোন কথা বা এমন কিছু বলবে না যাতে দ্বন্দ্ব ভরা থাকে। বাপ-বেটা যখন সম্পর্ক করেছ, বাবার আদেশ ছাড়া কোন কাজ তোমাদের করা চলবে না। যেখানে যা বলা প্রয়োজন বাবা সামনাসামনি বলবেন। কেউ যদি বলে, বাবা ডেকেছেন, বাবা চিঠি লিখেছেন, সেই সমস্ত নিয়ে তোমরা মাথা ঘামাতে যাবে না। পরিষ্কার কথা, বাবাকে জিজ্ঞাসা করে নেবে। একেক জায়গায় একেকরকম কথা বলে, আক্রমণ করে ইচ্ছামতন খুশীমতন যারা কাজ করে যাচ্ছে, তোমরা পরিষ্কার তাদের জানিয়ে দেবে, বাবার আদেশ ছাড়া তোমরা কোন কাজ করবে না। আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে সর্বত্র সর্বজায়গায় একেকযুগে একেকসময়ে একেক পরিবর্ত্তনের মাধ্যমে এই সমাজের চেহারা পরিবর্ত্তিত হয়েছে।

দশ, পনের হাজার বছর আগে যখন জাতিগত বিবাদ ছিল না, নীতিগতও তেমন বিবাদ ছিল না, প্রত্যেকেই প্রতিটি জিনিস ভালভাবে জেনে নিত। আমার ও তোমাদের মাঝে এই সম্পর্কের গুরুত্ব বজায় রাখার জন্য নিজেদের মধ্যে কোনরকম ভুলভাল কথা বলবে না। এমন কোন কথা বলবে না, যাতে উত্তেজিত হয়। তোমাদের কাজ, যা করতে বলা হবে, সেটাই হবে সবচেয়ে বড় কথা। তোমাদের বুদ্ধি আছে, বিবেচনা আছে, ঘরসংসার রক্ষা করতে হবে। স্বামী-স্ত্রী পুত্র তাদের দেখতে হবে। সেগুলো দেখার পর, সংসারের কর্ত্তব্যকর্ম করার পর বেদপ্রচারকল্পে সমাজে নূতন কিছু দেবার প্রয়োজনে আমরা যাব। **ব্যক্তির স্বার্থে বা নিজ নিজ স্বার্থে এমন কথা বলবে না, যেটা তোমাদের পক্ষে, সংগঠনের পক্ষে ক্ষতি হয়। তোমরা পরিষ্কার নীতিতে থাকবে। এরমধ্যে বহুজনের বহুরকম বুদ্ধি আছে, যেটা আমি জানি না; আমার জানার মধ্যেই আসছে না**। সেই সমস্ত কাজ যদি তোমাদের হাতে আসে, তোমাদের কাছে বলে, সে leader-ই বলুক, আর যেই বলুক, তাতে তোমরা বিচলিত হবে না। সত্যি কথাটা আমি যেটা বলবো, আমাকে জিজ্ঞাসা করে নেবে। সেইমতে কাজ করবে।

কেউ কেউ আছে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, দলভারী করার জন্য অনেক কিছু বলে। সেই সমস্ত দলভারীর চিন্তায় তোমরা কাজ করবে না। পরিষ্কার নীতিতে তোমরা কাজ করবে। যেটা বলবো, যেভাবে বোঝানো হবে, সেইভাবে তোমরা চলবে। বহুজনের বহুকথা প্রত্যেক দলের মধ্যে প্রত্যেক সংগঠনের মধ্যেই থাকে। তোমাদের সংগঠনের কার্যকলাপের মধ্যে এমন কিছু করবে না, যার মধ্যে উচ্ছ্বাসে ভরা। ভাব আর উচ্ছ্বাস দিয়ে কোনদিন কাজ ভাল হয় না। পরিষ্কার নীতিতে থাকবে। প্রতিটি কাজে বিবেচনা থাকবে। একজন একটা কথা বললে সেটা নিয়ে উক্তি করবে না। ভাল করে শুনবে। তারপর শেষ decision-টা জানার জন্য বাবার কাছে বলবে। বাবা যদি সেই কাজ করতে বলেন, করবে। যদি করতে না বলেন, চুপ করে থাকবে। তোমাদের সাথে যে আন্তরিকতা ও ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে তুলেছি, আমি যা করতে চাই, সেটুকু করতে হলে, সেইভাবে সংগঠন তৈরী করতে হলে, কতগুলো নিয়মকানুন আছে, সেইমত চলতে হবে। সেইভাবে সংগঠনকে তৈরী করতে হলে যা যা চিন্তা করা দরকার, যতটুকুনু ভালবাসা দরকার, ততটুকুনু ভালবাসা নিয়ে তোমরা চলবে।

আজ সমাজ চরম অবস্থায় নেমে গেছে। কাকে বলবো, কে শুনবে। বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায় প্রায় সব সংগঠনেই চলছে দলাদলি। আমরা তো রাজনীতির সংগঠন করতে যাইনি বা ভোট কুড়াতেও যাইনি। সেই বাচ্চা বয়স থেকে আমি যতটা পারছি, বলে যাচ্ছি। কিন্তু তা বলে আমার কথাগুলো নিজেরা একেকরকমভাবে ব্যাখ্যা করে বলে যাবে, সেটা তো ঠিক নয়। তোমাদের মধ্যে আমার মধ্যে কোন বিরোধিতা নাই। তোমার ভাল কথা আমি শুনবো, আমার ভাল কথা তুমি শুনবে। দুজনের মিলনের সুরে যেটা হবে, তাতে দুজনেরই দায়-দায়িত্ব থাকবে। বাবার কাছে দায়িত্ব দিয়ে চলে গেলে চলবে না। বাবার দায়িত্বও তোমাদের নিতে হবে।

আমি সেই শিশুবয়স থেকে প্রকৃতির আদর্শে, সাম্যনীতির আদর্শে সমাজকে গড়ে তোলার জন্য বলে যাচ্ছি। ধর্মের আসল তত্ত্বটা কি, আসল ভিত কি, বলতে চাইছি। সেইজন্য আমার নাম দিয়েছে 'বালক ঠাকুর', 'বালক গোঁসাই', 'বালক ব্রহ্মচারী'। কিন্তু ধর্মের আসল তত্ত্বের কথা কেউই বলতে চায় না, বুঝাতেও পারে না। সেটা বুঝাতে পারলে ধর্মের নানারকম ধারা নিয়ে এইরকম বিভেদ সৃষ্টি হতো না, দলাদলি হতো না। যদি ধর্মের আসল অর্থটাকে সবাই বুঝে নিতে পারতো, তাহলে এত সমস্যার সৃষ্টি হতো না। যাদের জন্ম হয়েছে, সবাই এক জাতিতে থাকতো, এক সুরে থাকতো। ধর্ম নিয়ে যত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে, দলাদলির সৃষ্টি হয়েছে, সবই ধর্মের আসল ব্যাখ্যা, আসল তত্ত্বের ভিত্তি না জানার ফলে। লক্ষ লক্ষ কথা, আর মনগড়া অর্থ নিয়ে ধর্ম চলে না। যুক্তি, বিজ্ঞান, গণিত সবকিছু আছে ধর্মের অর্থে।

ধর্ম কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। ধর্মের সুর, ব্যাপ্তির সুর। বিরাট ভাবে, বিরাট সুরে, বিরাট তত্ত্বে এর অর্থ ভরা। **বেদ, বেদান্ত, উপনিষদে ও আরও নানা শাস্ত্রে অনেকরকমের ধর্মের কথা আছে। তন্ত্র দিয়ে মন্ত্র দিয়ে সবকিছুর একটা অর্থ বের করা হয়েছে। সেই অর্থে যা করতে চেয়েছিলেন শাস্ত্রকাররা, পরে তার বিপরীত দিকটাই ভেসে উঠেছে।**

তোমাদের আগে জানতে হবে ধর্মের সঠিক অর্থ। সেইমতে সেইভাব নিয়ে সেইপথ নিয়ে সবাইকে চলতে হবে। আসল অর্থটাকে জানতে না

পারলে, সঠিক পথ ধরে চলবে কিভাবে? একেকজন ধর্মের অর্থটাকে এমনভাবে বলে যাতে যার যার মতের প্রতি সবাই আকৃষ্ট হয়। কিন্তু আসল অর্থটা এখন পর্যন্ত বুঝাতে পারছে না। ধর্মের আসল অর্থই জানে না; শুধু মনগড়া কথা। এই মূর্ত্তি বল, পূজা বল, করতে আপত্তি নাই। মন্দির কর, পূজা কর, আনুষঙ্গিক আচার অনুষ্ঠান কর, প্রচার কর, সবই কর কিন্তু আসল অর্থ কোথায়? তাদের প্রচারে বেশীরভাগই আলাদা একটা শ্রেণী গড়ে উঠেছে। হিন্দু ধর্ম বলে আলাদা কোন জিনিস নাই। একটাই ধর্ম জীবধর্ম। নিজেদের নামগুলো যেমন ভিজা ভিজা থাকে, ধর্মটাকেও তেমন ভিজা ভিজা করেছে। নিজ নিজ সম্প্রদায়কে বড় করার জন্য নানারকম বিবৃতি, ঘটনা অনেক কিছু ধর্মে আছে। কিন্তু তোমরা অযথা অত শাস্ত্র, বেদ বেদান্ত, তন্ত্র-মন্ত্র ব্যাখ্যার মধ্যে যাবে না। ধর্মের প্রকৃত অর্থে একটাই কথা আছে। সেখানে মিলনের সুর আছে, ঐক্যের সুর আছে। সেখানে জাতিগত বিবাদ থাকবে না, বিচ্ছেদ থাকবে না। কিন্তু আমরা বিচ্ছেদের মধ্যে পড়ে আছি। যার জন্য আজ পৃথিবীর ইতিহাসে যতদূর পর্যন্ত তোমরা জান, একজনও ধর্মের আসল কথা শোনাতে পারেনি। এই পৃথিবীর খাতায় পাতায় যত নাম, যত ঐশ্বর্য শেষবেলা আর থাকে না।

মৃত্যু যখন আছে, টিকিট কেনা হয়ে গেছে প্রত্যেকের। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছ সবাই। গাড়ী যখন আসবে, ঐ টিকিট পকেটে নিয়ে গাড়ীতে উঠে টা টা করে চলে যাবে। টিকিট পকেটে নিয়ে মৃত্যুরে যখন জানো, বিবাদ কেন আসবে? আমরা অন্যের সাথে বিবাদ করতে যাব কেন? তোমরা তোমাদের সঠিক পথ ভিতর থেকে খুলে নেবে। সুরের পথ খুঁজে নেবে, বের করে নেবে। সেই সুরের পথ দিয়ে তোমরা চলবে। সবাই চলবে। ধর্মের আসল ব্যাখ্যা, আসল কথা সম্পর্কে অল্পবিস্তর কেন জেনে নেবে না? তোমরা সবাই জেনে নেবে।

ধর্মের অর্থ যোগ, ধর্মের অর্থ বিয়োগ, ধর্মের অর্থ পূরণ, ধর্মের অর্থ ভাগ। এই কথাগুলি মনে রাখবে। মনে থাকবে তো? — আজ্ঞে, হ্যাঁ।

যোগ, বিয়োগ, পূরণ, ভাগ এই কটা নিয়ে তোমরা চলো। এর বাইরে যা আছে, তা থাক। পরিষ্কার যোগ, বিয়োগ, পূরণ, ভাগ নিয়ে তোমরা

চলবে। যেখানে যোগাযোগ করা প্রয়োজন, সেখানে যোগ করবে। মনে রেখো, যেই যোগাযোগে যেই প্রয়োজনে তোমাদের উন্নতি হতে পারে, ভালভাবে সংগঠন গড়ার কাজে সাহায্য হতে পারে, সেটাই হবে যোগ। সেই যোগাযোগে যুক্ত ক্রিয়া, ভাষণ সবই যোগ। কিন্তু যাদের সাথে যোগাযোগ করলে ক্ষতি হবে, সেখানে যাবে না। সেদিকে যতটুকুনু তোমাদের বাদ দেওয়া প্রয়োজন, বাদ দিয়ে দেবে। সেদিক দিয়ে তোমরা যাবে না। যতরকম ক্ষতিকারক বাক্য, যতরকম ভাষণ, তাতে তোমরা পা দেবে না। যাতে ক্ষতি হতে পারে, সেটা বাদ দেওয়াই বিয়োগ। জীবনের ছল চাতুরী, জীবনের নানা অপরাধ যা কিছু আছে, সব বিয়োগ করে দাও। শুধু স্বচ্ছ ভালবাসাটুকু রাখবে।

যোগ-বিয়োগের পরে হল পূরণ। আজ **জীবজগতে প্রাণীকুল পূরণের আশায় পূরণের জায়গায় আমরা চলছি। সমস্ত বিশ্বজগৎ এই মহাশূন্যকে পূরণ করার জন্য সদাই ধাইছে (ছুটছে)। যেটুকুনু দরকার সেইটুকুনু পূরণ করবে।** পূরণ করে তোমার জীবনযাত্রা নির্বাহ করবে। ইস্কুলে পড়া করেছ না? পরীক্ষা দিয়েছ না? শূন্যস্থান পূরণ কর। সেই পূরণের সূরে পূর্ণ হও। এই পূরণের জন্য, এই মহাশূন্যকে পরিপূরণের জন্য পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্ররাশি সেই আশায় সেই সুরে আজও চলেছে। কোটি কোটি বছর যাবৎ এই সূর্য চলছে মহাশূন্যকে পরিপূর্ণ করার জন্য। তোমরা পরিপূর্ণতার সুরে ডুবে থাকো। খুঁজে পাবে সেই নিখোঁজের সাড়া।

তারপর আসলো ভাগ। আমাদের দেশে যার যতটুকুনু দরকার, ততটুকুনু ভাগ করো। প্রয়োজনের বেশী কেউ ভোগ করতে পারবে না। হাতী যদি পাঁচটা কলাগাছ খায়, ছাগে (ছাগল) কি খাবে পাঁচটা কলাগাছ? ছাগের খোরাক, মনে কর ১০টা কাঁঠাল পাতা। ১০টা কাঁঠালপাতা খেয়েই ওর (ছাগলের) পেট ভরলো। পাঁচটা কলাগাছ খেয়ে হাতীর পেট ভরলো। কেউ কাউকে কিছু বলতে পারবে না। ছাগ বলতে পারবে না হাতীকে যে, ''তুমি আমার থেকে বেশী খাচ্ছ।'' ওর যা প্রাপ্য, যা প্রয়োজন 'ও' (হাতী) নিচ্ছে। এইরকম ভাগ থাকবে প্রয়োজন ভিত্তিক। এইভাবে যোগ, বিয়োগ, পূরণ, ভাগ তোমাদের হাতে রেখে দিও।

অযথা কথা বলবে না। যে যাই বলুক, কোন উক্তি করবে না। ঠাকুরের

নাম দিয়ে কেউ কোন কথা বললে, যেমন 'ঠাকুর যেতে বলেছেন', 'ঠাকুর এই কথা বলেছেন', ঐরকম মুখের কথা শুনে নেবে। ঠিক হলেও প্রত্যেকটি কথা বাবার কাছ থেকে জেনে নেবে। এটাই হল তোমাদের কাজ।

সাধনাটা মুখে মুখে হয় না। সেই কার্যের সাথে যোগাযোগ থাকা দরকার। প্রত্যেকে নিজের কার্যকলাপ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকবে। তোমরা কেউ এমনি খুন করনি, মনে করো। কিন্তু তোমরা খুনের দায়ে পড়ে গেছো। প্রকৃতির দরবারে যদি তোমাদের ডাক পড়ে, একটাও রেহাই পাবে না। কত হাজার হাজার খুন করেছ একেকজনে, চিন্তা করেছ কোনদিন? একটা মানুষ মারলে এখানে তার সুবিচার হয়। কিন্তু প্রতিদিন তোমরা কত খুন করে চলেছ। মনে রেখো, তোমাদের বিচারের ধারায় পড়তে হবে। আমি বলছি না; প্রকৃতির বিচারে, প্রকৃতির সুরে তোমরা যে কত খুন করেছ, বলে শেষ করা যায় না। একটা বীজ থেকে একটা মানুষ হয়। একটা বীজ থেকে একটা গাছ হয়। হয়তো?

— আজ্ঞে হ্যাঁ।

— একটা গাছ হলে তারমধ্যে আবার হাজার হাজার বীজ তৈরী হয়। সেই বীজগুলো থেকে আবার এক একটা করে বীজ পুঁতলে গাছ হয়। একেকজন ৪/৫টা করে বাচ্চা তোমরা দিচ্ছ। সাত/আট বা নয়/দশ জনও অনেকের থাকে। তোমরা কি মনে করছো, যার যার বাচ্চা এই কয়টা? কিন্তু খুনতো তোমরা করে চলেছ। প্রকৃতির বিচারে, প্রকৃতির সুরে, বাস্তবতার সুরে তোমরা যে কতজন আছ, প্রত্যেকে ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক খুন করে চলেছ। একটা ইলিশমাছের থলিতে কত ডিম থাকে না? বিন্দি-বিন্দি অনেক ডিম, কয়েক লাখ হবে। দুইটা খইলতায় (থলিতে) কয়েক লাখ ডিম থাকে। ঠিকমতন যদি বাচ্চা হয়, নদী ভরে যাবে। একটা ইলিশমাছের ডিমে নদী ভরে যায়।

আমরা খুন করছি কোথায়? খুন করছি অনেক। বীর্যপাত যেখানে হয়, সব বীর্যপাতের মধ্যে হাজার হাজার মানুষ থাকে। ভিতরে (গর্ভে) গিয়া ওরা (বীর্যকীট) জায়গা পায় না। ওরা মরে যায়। সারাজীবনে দুইটা থেকে ছয়টা বাচ্চা হোক। ওরা ঢুকে পড়ে। ভিতরে ঢুকে পড়ে। বাকী সব

বেরিয়ে যায়। তুমি সারা জীবনে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় বীর্যপাত করে গেছ। তোমাদের একটা জীবনের ঐ বীর্যগুলি যদি জমিয়ে রাখি, এক বালতি হবে না? তার বেশীও হতে পারে। সারাজীবনের বীর্যপাতের বীর্যগুলি যদি একটা বালতির মধ্যে রাখি, তবে তারমধ্যে কোটি কোটি বাচ্চা, কোটি কোটি মানুষ থাকে। মনে করো, দুটি চক্ষু তোমার। ঐ কোটি কোটি বাচ্চার প্রত্যেকেরই দুটি করে চক্ষু আছে। দুটি করে কান আছে। একটি করে নাসিকা আছে। সব ইন্দ্রিয় আছে। কোটি কোটি বাচ্চা বেরিয়ে গিয়ে ৪/৫টা বাচ্চায় ঠেকলো গিয়ে।

তোমার ভিতরে যদি ৫০ হাজার কোটি মানুষ থাকে, তবে ১০০ হাজার কোটি চক্ষু আছে না? ১০০ হাজার কোটি কান আছে। ৫০ হাজার কোটি নাক আছে। ঐটুকুর মধ্যে সব। ওরা সব মরে গেল। কেন বিশ্বপ্রকৃতি সৃষ্টির তত্ত্বে প্রকৃতির সুরে একটা মানুষের মধ্যে এতগুলি মানুষ দিলেন? জীব জগতে একটা শেফালী গাছ পুঁতলা। তার মধ্যে কত ফুল ফোটে। সবকিছুর মধ্যেই তাই। **এই সৃষ্টিতত্ত্বে একটা জীবের মধ্যে এত জীব কেন দিলেন? একটা লোকের দুইটা চক্ষু। তার মধ্যে যদি কোটি কোটি চক্ষু থাকে, বুদ্ধি থাকে, বিবেচনা থাকে, শক্তি থাকে, সবলতা থাকে, সাধ থাকে, ক্ষমতা থাকে, তবে ঐ ক্ষমতাবলে সে কী না করতে পারে?** একটা মানুষ হয়ে যদি ৫০ হাজার কোটি মানুষ তোমার মধ্যে থেকে থাকে, তবে প্রকৃতি ঐ মানুষগুলি তোমার মধ্যে কেন দিলেন? প্রকৃতি কি ভুল করে দিলেন? এত সুসজ্জিত, এত সুন্দর করে সাজানো পৃথিবী, এখানে সবকিছু সাজানো। চোখের উপরে ভুরু। জল যাতে সবাসরি চোখের মধ্যে না পড়ে, তার জন্য ভুরু দিয়ে দিয়েছে। গাড়ীতে যেমন থাকে, ঠিক তেমনই। এরকম সাজানো জিনিস; নিখুঁতভাবে সাজানো। আশ্চর্য ব্যাপার। কে এরমধ্যে বুদ্ধি দিল? কে এর সৃষ্টি করলো? কে এর পিছনে আছে? কারণ ছাড়া এটা তো হয়নি। কারণটা কি?

আমি একটা ব্যক্তি। এত কোটি কোটি মানুষ আমার মধ্যে থাকার কি কারণ আছে? প্রত্যেকের মধ্যেই আছে। সে কি অপচয়ের জন্য? অপচয় করতে কি বলে? অপচয় করতে তো বলে নাই? তোমার মধ্যে ওরা বসবাস করছে। অতগুলি চক্ষু পরিস্ফুটিত করছে। কেন করছে? তোমার যদি দুটো

মাথা হয়ে যায়, একটা মাথা বাদ দিলেই তো হয়ে যায়। বাদ দিতে তো বলে নাই? জীবজগতে যে সমস্ত জীবগুলি দেহের ভিতরে আছে, ওরা অকারণে নর্দমা দিয়ে চলছে কেন? তোমাদের ভিতরে ৫০ হাজার কোটি করে মানুষ কেন আছে? তারা পরতে পরতে চলছে। সব বেড়িয়ে যাচ্ছে। বেড়িয়ে যে যাচ্ছে, তাদের বের করে দেবার জন্য তোমাদের কত চেষ্টা। তারজন্য তোমাদের কত চিন্তা, প্রেম, ভালবাসা কত কিছু। তাদের বের করে দেবার জন্য প্রকৃতি তো দেয় নাই। ৫০ হাজার কোটি মানুষ যদি তোমার মধ্যে থাকে, তাদের কি করে বের করবে, তারজন্য চলছে আনুষঙ্গিক সব কিছু। এই সমাজে চলছে তারই কার্যকলাপ। প্রেম করে বল, ভালবাসা করে বল, জোর করে বল, যাই বল, ঐগুলিতো বেরিয়ে যাচ্ছে। তার বিচারটা কে করবে? এতগুলি মানুষ প্রকৃতি কেন দিল প্রত্যেকের মধ্যে? আর কেনই বা নষ্ট করছো? সখেই করছো, নিজেই করছো। তার শাস্তি যদি আসে কখনও, কথার কথা বলছি, তার থেকে পার পাবে না। তোমার মধ্যে এতগুলি মানুষের শক্তি, বুদ্ধি, বিবেচনা, দর্শন শক্তি, স্পর্শন শক্তি, শ্রবণশক্তি সব রয়েছে। ভিতরে থেকে বাস্ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। বাচ্চা যে কটা দরকার হয়ে যাচ্ছে। কারও বাচ্চা হয়ও না, পড়ে যাচ্ছে। তাই এমতাবস্থায় বিচারের দরবারে তোমাদের জবাবটা কি? প্রকৃতিকে কি জবাব দেবে?

একটা মানুষের মধ্যে এতগুলি মানুষ, এতগুলি মানুষের শক্তি কেন দিল? দুইটা চক্ষু দিয়ে দূরদূরান্তরে গ্রহগুলি দেখ। লক্ষ লক্ষ মাইল দূরের গ্রহগুলি তোমার দুইচক্ষের ক্ষমতা দিয়ে এতটুকু দেখ। ৫০ হাজার কোটি মানুষের ১০০ হাজার কোটি চক্ষুর দৃষ্টি যদি তোমার একদৃষ্টিতে এসে পড়ে, তবে তুমি কী না দেখতে পার? সেটা করার জন্যই তোমার এই ব্যবস্থা। আর সেগুলি বের করে দেবার জন্য, নষ্ট করে দেবার জন্য কত উপায়। এতে তো লজ্জা হওয়া উচিত। **আমরা তো বীর্যগুলো ফেলে দেওয়ার জন্য উৎসব করি। বীর্য ফেলার উৎসব। এইভাবে যে কত কোটি কোটি মানুষ drainage হচ্ছে, তা বলার নাই।**

প্রকৃতি এতগুলি মানুষ তোমার মধ্যে দিয়েছে কেন? তুমি তোমার দুই চক্ষু দিয়ে যতটা দেখ, তার মধ্যে যদি ৫০ হাজার কোটি মানুষের ১০০ হাজার কোটি চক্ষুর power যুক্ত হয় এবং তাদের সাথে এক যোগাযোগের

সূত্রে যতদূর পর্যন্ত সম্ভব সম্পর্ক যদি করতে পার, তাহলে এখানে বসে যেমন দেখে, ঐভাবে গ্রহগুলিকে এখান থেকে দেখতে পাবে। গ্রহগুলির ভিতরে কি হচ্ছে, কে কি করছে, সব দেখতে পাবে। ৫০ হাজার কোটি মানুষের ১০০ হাজার (একশো হাজার) কোটি চক্ষু যদি একটি মানুষের দুটি চক্ষুতে যুক্ত হয়, তবে চোখের দৃষ্টি কত প্রখর হবে। ৫০ হাজার কোটি মানুষের মন এক মনে আসলে, কত প্রখর বুদ্ধি তৈরী হবে। সেই সব মনে পাবে, জ্ঞানে পাবে; দর্শনে পাবে, শ্রবণে পাবে কত সুন্দর, কত সহায়রূপে সব জমা হয়ে আছে তোমার মধ্যে। প্রকৃতি কত সহায় করে, সুযোগ করে দিচ্ছেন। অদ্ভুত ব্যাপার। এখানে বসে দুনিয়ার খবর,গ্রহ নক্ষত্রের কথা সব জানতে পারবে। চাঁদে কি হচ্ছে, সূর্যে কি হচ্ছে, অনন্ত বিশ্বের গ্রহ নক্ষত্রের সব খবর জানতে পারবে। ঐ ৫০ হাজার কোটি মানুষ তোমাকে সাহায্য করবে। আর ঐ ৫০ হাজার কোটি মানুষের যখন শক্তির স্ফূরণ হবে, দেখবে কি বিরাট আনন্দ। অথচ আমরা এখানে পাচ্ছি ক্ষয় করে আনন্দ।

এমন বেকুব কে আছে? নিজের রক্ত, নিজের জন, নিজের লোক তোমার মধ্যে ভরপুর। আর তুমি কি করছো? এগুলোকে ফেলবার জন্য কি ব্যস্ততা? একজনরে চিঠি লিখলা, পত্র লিখলা, প্রেমের কথা লিখলা, ভালবাসা হ'ল, দেখাশুনা চললো— এইগুলি করে করে দুইজনের মতামতে পতন; সব ফেলে দিয়া আসলা। এই দুঃখটা এখন বেশী লাগছে না, বুঝতে পারছো না বলে। এই দুঃখটা পরবর্ত্তীকালে বুঝবা। জন্ম যখন আছে, মৃত্যুটা যে অনিবার্য, এটা তো বুঝে নিয়েছ? মৃত্যুটা যে আছে, বুঝতে পারছো তো?

— হ্যাঁ বাবা।

— তাহলে? এরচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত কি হতে পারে? **প্রকৃতি এই মহাদৃষ্টান্ত, জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত তোমাদের সামনে রেখেছে। একটা জীবন তোমাদের ৮০/৯০ বছরেই শেষ। বীর্যটা তোমাদের রক্ষা করার জন্য, আনন্দ দেবার জন্য। আনন্দটা কেন? বীর্যপাত করে যারা আনন্দ পায়, তারা মহানন্দ পাবে, যদি বীর্যকে রক্ষা করতে পারে।** এটা ছাড়াতে আনন্দ, ফেলাতে আনন্দ। প্রেম তুমি করছো, ভালবাসা তুমি করছো, বাচ্চা তুমি দিচ্ছ। আনন্দ তো ভিতরে রয়ে গেল। বাইরে কিছু নেই। এই যে বীর্যপাত হচ্ছে

তাকে ফেলবার জন্য কত ব্যবস্থা। বিয়েশাদি; এখানে যায়, ওখানে যায়। ওভাবে যাচ্ছে, স্বপ্নে যাচ্ছে, ইচ্ছাকৃতভাবে যাচ্ছে। নানারকমভাবে এত দামী জিনিসগুলো তোমরা ছেড়ে দিচ্ছ। তারপরে আবার কথা। খুন করে এক ব্যক্তিকে, সেটাই বড় হয়ে গেছে। এখানে বড় ছোট কিছু নেই। কত খুন করছো, চিন্তা করে দেখো। সবতো খালি করে দিলা। তারপরে বিচার। একটা বীর্যপাতে কতগুলো মিথ্যা কথা বলতে হয়। ভালবেসে কত মিথ্যা কথা বলে। বীর্যপাতে ভিতরের জিনিস ছেড়ে দেওয়াতে অনেক ক্ষতি হয়ে গেল। ভিতরে ক্ষতি; বাইরে ক্ষতি।

কেন এই সৃষ্টি? কি কারণে সৃষ্টি? উদ্দেশ্য বিহীন সৃষ্টি হতে পারে না। **প্রকৃতি কেন একটা মানুষের মধ্যে ৫০ হাজার কোটি মানুষ দিলেন? তোমাকে সেই বিরাট সুরের পথে নিয়ে যাবার জন্য, সেই বিরাট সুরের পথ দিয়ে চলবার জন্য প্রকৃতির এই ব্যবস্থা, বুঝতে পেরেছ?** জল বল, মাটি বল, বাতাস বল, সমস্ত বিষয়বস্তুগুলো তোমরা পাচ্ছ এখানে। সবকিছু গ্রহণ করছো। কোন বিবেকাসম্পন্ন ব্যক্তি বলতে পারবে না যে, আমরা ইচ্ছা করে এগুলো করি না। তোমরা করে যাচ্ছ। কাজটাতো ইচ্ছা করেই করে যাচ্ছ। নিজের ভিতরে বোঝ কি না, বুঝতে তো পারছো?

— আজ্ঞে হ্যাঁ।

— নিজের ভিতরে বুঝতে তো পার, কাজটা ত্রুটি করছি। বুঝছো কি না?

— আজ্ঞে হ্যাঁ।

— **প্রত্যেকে বোঝে। অন্যের কাছে ফাঁকি দাও, বুঝতে পারবে না। নিজের কাছে ফাঁকি দিতে পারবে না। তুমি বোঝ কি না? কেন তুমি বুঝে শুনে এই কাজটা করতে যাচ্ছ? এর চেয়ে বড় অপরাধ কি আছে?** কেন তুমি যাচ্ছ? তাহলে কি মনে করো সৃষ্টি হবে না? পর্বতের জল ঊর্দ্ধ থেকে যেটা পড়ে, সেটা স্বাভাবিক। তাতে তোমাদের বাল বাচ্চা যা হবে, যথেষ্ট। ৪টা বাচ্চা থেকে ১০টা বাচ্চা কিছু না। পাত্রে পড়লো, ১টা, ২টা ভিতরে ঢুকে যায়, ব্যাস্। বাচ্চা হয়ে যায়। কত কষ্ট বাচ্চা হ'তে। প্রকৃতি তোমাকে বলছে। তোমাকে বাচ্চা না করতে তো বলা হয়নি। যথেষ্ট, যেটা উপচিয়ে পড়ে।

তোমাদের দেহের ভিতরে যে সপ্তচক্র আছে, মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রার, নাম দিয়েছে। সেই চক্রগুলির চারিদিকে গ্ল্যান্ড আছে, ছোট, ছোট, ছোট, ছোট। ঐ বীর্যের সংস্পর্শে যদি এখানে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে (দুই ভ্রূ-র মধ্যবর্ত্তী স্থানে) আসে, দেখবে, কয়েকদিন পরে দেখবে, আরেকটা বিষয়বস্তু তোমার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে। ক্রমশঃ ক্রমশঃ ঐ বীর্যগুলির লোকগুলি যদি থাকে, তোমার ভিতরে যদি রক্ষা করতে পার, তারা এক অনন্ত জগতের ছানা। মহাকাশের ছানাগুলি তোমার বুঝবার জন্য এত ব্যবস্থা করেছে যে, ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তবুও তো তারা তোমাদের ভোগের মাঝেও বেরিয়ে গিয়েও তোমাদের আনন্দ দিয়ে যাচ্ছে। তোমাদের রক্ত পড়ে গেলে ভাল লাগে? কেটে রক্ত পড়লে ভাল লাগে, বল?

— আজ্ঞে না।

— তবে? কাটলে ভাল লাগে না? আর বীর্যপাত করলে কেমন হয়, তখন তো ভাল লাগে? কি? বীর্য যখন পড়ে, তখন রক্ত পড়লো না? বীর্যের যে স্বাদ, সেটা রক্তেরই তৈয়ারী। তার স্বাদ আলাদা; আর রক্তের স্বাদ আলাদা। দেখ, একটা stage-এর পার্থক্য করলে কত ঊর্দ্ধে উঠে গেল। বীর্যপাত না করে বীর্য রক্ষা করলে, ঊর্দ্ধে চিন্তা করলে মহাকাশের মহানন্দের স্বাদ পাওয়া যায়।

বীর্যপাত যেভাবে করছো, ঐ যে বীর্য পড়ে একটু, সেটা তোমাদের ভাল লাগে। অন্যের ভাল লাগলো কিনা, সেটা আলাদা। তোমার বীর্য তোমার ভিতর থেকে পড়ে যাচ্ছে, সেটাই তোমার ভাল লাগছে। বাঃ, কি চমৎকার। কিন্তু এক ফোঁটা রক্ত বের হলে সেটা ভাল লাগছে না। যোগাযোগে যে থাকবে, যোগ বিয়োগ যে করবে, কারে বাদ দেবে? কোনটারে বাদ দেবে? যদি তুমি তোমার বীর্যকে রক্ষা করতে পার, তবেই সব সম্ভব। সময় চলে যাচ্ছে প্রত্যেকেরই। তুমি তোমার বীর্যকে রাখতে যদি পার, তাহলে এত উপকার পাবে যে, ভাষায় ব্যক্ত করতে পারবে না। গ্রহ নক্ষত্রগুলি আশ্চর্যভাবে যেভাবে মহাশূন্যে ঘুরছে, যেভাবে কাজ হচ্ছে, অন্য কোন কথায় কিছু হবে না।

ধর্ম সম্পর্কে বহুকথা, মনগড়া কথা অনেকে বলে। ধর্ম মনগড়া হতে পারে না। ধর্ম বাস্তবে পরিণত হবে, বাস্তবের সাথে সত্যের সাথে ধর্মের যোগ হবে, তবে তো কাজ হবে। তোমার ৪টা বাচ্চার ৮টা চক্ষু। এই ৮টা চক্ষু তোমার মধ্যে ছিল। এই ৮টা চক্ষু তোমার মধ্যে থেকে পরিস্ফুটিত হল। তাহলে ৫০ হাজার কোটি মানুষের একশো হাজার কোটি চক্ষু যার মধ্যে বিরাজ করছে, সেই ব্যক্তি যদি এগুলি সংগঠিত করে, পাঁচশো লোকের ইউনিয়ন কত কাজ করে, আর ৫০ হাজার কোটি মানুষের ইউনিয়ন করতে পারলে, কে তোমাকে আটকাতে পারে জগতে? মহাশূন্যের পথে ছুটছে যারা, সেখানে চন্দ্র রয়েছে, সূর্য রয়েছে, গ্রহ রয়েছে এবং মানুষের সুখ সাড়া সবই রয়েছে। তারমধ্যে কেন তুমি যাচ্ছ না? এত সুন্দরভাবে এত সুযোগ তোমাকে দিয়ে দিয়েছে, আর তুমি বসে বসে সেই বীর্যগুলিরে ফেলাইয়া (ফেলে) বুদ্ধিগুলিরে নষ্ট করছো। **যে পর্যন্ত মন বুঝতে পারে, সেই পর্যন্ত তোমারে সাবধান থাকতে হবে। একটা আকাম (কুকাজ) করতে গিয়া যদি তোমার বিবেকে না লাগে, সাড়া না লাগে, তবে বুঝতে হবে ঐ side-টা তোমার blocked আছে, বন্ধ আছে।** কিন্তু এতগুলো সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে, এতগুলো বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে, এতগুলো ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও অপরাপর ইন্দ্রিয়গুলো দিয়ে তোমাকে ঢেলে সাজিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতি তোমাকে ঠেলে দিচ্ছে, যাও বোঝ, আমাকে স্মরণ করো। যত অশান্তি আসুক, যা কিছু আসুক, আমার বীর্য আমি আটকে রাখবো; সেই পরম সংকল্পের মন নিয়ে চলো। দেখবে, প্রত্যক্ষভাবে যে পর্যন্ত তোমাদের বাইরের চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছ, যতটুকু পাচ্ছ, ততটুকু পর্যন্ত তোমার যাওয়ার permission আছে। ততটুকু ক্ষমতা প্রকৃতি তোমাকে দিয়ে দিয়েছে।

একটা গ্রহে যেতে গেলে কত কোটি বছর লাগবে। কিন্তু তোমাকে যাওয়ার জন্য কোন চেষ্টা করতে হবে না। যেগুলি (বীর্যকীট) স্বাভাবিক তোমার মধ্যে আছে, এগুলিরে আটকাও। আটকে কাজে (জপে) বসো। কিছুদিন পরে নিজেই বুঝতে পারবে, কিভাবে সুরটা ভেসে ভেসে খুলে যাচ্ছে। বাক্স খুললে যেরকম, সেখানে সবকিছু বুঝতে পারবে। এই এক অপরাধ (বীর্যপাত) বুঝে শুনে কেন করছো? তোমার জিনিস তুমি রক্ষা করবে। এখানে হারাবার ভয় তো নাই। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বছর ধরে

জীবজন্তু জানোয়ার সবাই এই পথে উপভোগ করছে। সাময়িক উপভোগ, তাতেই মত্ত।

সংসারে সবাই যে যা কাজ করছো, বুঝে শুনে করবে। **বাপ-বেটা-বেটির সম্পর্ক করেছি, যে বীজটা কর্ণমূলে দিয়েছি, স্মরণ করবে। এখানে ঝগড়া বিবাদ করে, কে কি বললো, না বললো, তাতে সময় নষ্ট করে পাপমুক্ত হতে পারবে না। বহুৎ কষ্ট আছে তোমাদের।** যেখানে এই পরিদৃশ্যমান জগতে সবকিছু এত সুন্দর, এত সুন্দরভাবে সুসজ্জিত। এই দেহযন্ত্রের দিকেই তাকিয়ে দেখ না, এখানে হার্ট, এখানে স্টমাক, এখানে গলব্লাডার, এখানে লিভার— এত সুন্দরভাবে যেখানে সাজানো, প্রকৃতি সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিয়েছেন, সে কি ক্রটির মধ্যে ফেলে দেবার জন্য? প্রকৃতি তোমাকে ক্রটির মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছে না। তোমাকে বুদ্ধি দিয়েছে, বিবেচনা দিয়েছে। দেখ, শোন, কাজ কর। তবেই হবে সব। জীবনতো চলে যাচ্ছে। এগুলো তো আটকাতে পারছো না। কি নিয়ে যাবে? আজও একটা মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলে। বীর্যপাত হয়ে গেল। কিভাবে নষ্ট করছো। কি সুখ পাচ্ছ? কিয়ের (কিসের) ছাতার (ছাতকুরা) প্রেম। **প্রেম এখানে আছে নাকি? একটা মেয়ের যদি গোদ হয়, ভালবাসতে পারবি? কারে ভালবাস? তোগো (তোদের) থুথু মেয়েলোকে ভালবাসে? কফ ভালবাসে? কৃমি ভালবাসে? তবে ছাতা কি ভালবাসে? তুই একটা লোকের এগুলি ভালবাসতে পারলি না, তবে কি ভালবাস?** তবে ভালবাসাটা কোথায়? নোংরা খাইতে ভালবাস? সেটা ভাল লাগে? যে যা করিস তোরা, সব চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। এখানে আবার লজ্জা কি? আকাম (কুকাজ) করবি ইচ্ছামতন, সেখানে আবার লজ্জা? এটা চরম দুঃখজনক। চরম দুঃখের ব্যাপার। বুঝতে পারছিস না এখন। সব বেরিয়ে যাচ্ছে।

প্রকৃতি ভোগ করতে তো না করেনি। চোখ দিয়ে দেখিস বলে ১ ঘণ্টা সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারবি?

— না, বাবা।

— তবে? সূর্যকে ঢাকা দিয়ে আড়াল করে চলবি। সব তোমাদের যা চলছে, সবাই ঢাকা দিয়া চলছো। ঢাকা দেওয়ার কি আছে? রক্ত পড়ে এতে

তো বলতে লজ্জা লাগে না। বীর্য পড়ে, এতে লজ্জা লাগবে কেন? বীর্য পড়ছে, এটা বলতে পারছিস না কেন মানুষের কাছে? কেন তোরা আসল বস্তুটাকে ফেলে দিচ্ছিস্? এতবড় দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার যে, আসল বস্তুটাকে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। একটা মানুষের বাচ্চাকে ফেলে দিতে পারবি?

— আজ্ঞে না।

— একটা মানুষের বাচ্চাকে ফেলতে পারবি না। কিন্তু ভিতরের ঐ বাচ্চাগুলোকে ফেলে দিচ্ছিস্। আগে ভিত ঠিক কর। যাবার রাস্তা ঠিক কর। সময় (মৃত্যু) কিন্তু আইসা পড়ছে। ভিত ঠিক কইরা (করে) কাজ কর। নিজের ঘর রক্ষা করে, সংসারের কর্ত্তব্য করে নিজের কাজ কর। যা জোটে, তাই দিয়েই চল। তুমি তোমার আসল জিনিস রক্ষা কর। এমনি পড়ে যাক, উপচিয়ে পড়ে যাক, তাতে কিছু না। আমি দেখবো যে, একবছরে কতটা পারিস্ তুই রক্ষা করতে।

অনেকে বড় বড় কথা বলে। এই যোগ কর, তপ-কর, ধ্যান কর, পূজা কর, হ্যান কর, ত্যান কর। কর কর, সব কর, ক্ষতি নেই কিন্তু আসলটা যে ভিতরে আছে, সেটাকে রক্ষা কর। সেই আসলটাকে এভাবে নষ্ট করছিস কেন? এই তো ৮০ বছরের খেলা তোগো (তোদের)। ৮০ বছরেই শেষ। তার মধ্যে সব ফেলে দিচ্ছিস। এটা হল আগে। তোমাদের যাওয়ার পথের টিকিটটাতো ভাল করে কেটে নিতে হবে। টিকিট লুকাইয়া (লুকিয়ে) তো আসল জায়গায় যাইতে পারবা (যেতে পারবে) না। তাই সবাই যারা সন্তান হয়েছ, বাপ-বেটা-বেটির সম্পর্ক করেছ, বাবা তোমাদের ভিতরের হিতাকাঙ্খী। বাইরে টাকা-পয়সার লেনদেন তো কারও সাথে করিনি। **তোমরা এত বোকা হলে কি করে চলবে? প্রত্যেকে সংকল্প করবে, আমার বীর্য, আমার সুখ আমি যদি রক্ষা করি, কারও নষ্ট করার ক্ষমতা আছে? তুই রক্ষা করলে তুই তো পাবি। তবে?**

তোমরা আমাকে ভালবাস। তোমরা কোন কথা কারও কাছে এমনভাবে বলবে না, যাতে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কোন কথা বলবে না। নিজেরা সুন্দরমতো চলবে। বাবা হিসাবে সময়মতো আমি তোমাদের ডাকবো, তোমরা কাজ করবে। অযথা কাজে তোমাদের আমি লাগাতে রাজী

নই। আমি কাউকে বিভ্রান্ত করতে চাই না। আমি অবতার সাজতে চাই না, ভগবান সাজতেও চাই না। পরিষ্কার কথা। বাচ্চাবয়স থেকে যতটা বুঝেছি, যতটা দেখেছি, সেইটাই তোমাদের কাছে পরিবেশন করতে চাই। কোনরকম অযথা কথা, অযথা উক্তি আমি করতে রাজী নই। যা practical, যা সত্য, সেইটুকু নিয়েই আমি থাকতে চাই। তোমাদের সাথে আমার অর্থের সম্পর্ক নয়। আমার লক্ষ লক্ষ সন্তান আছে। কোনদিন কেউ বলতে পারবে না, কারও কাছে দক্ষিণা চেয়েছি। অর্থের আমার প্রয়োজন আছে। আমি পরিশ্রম করে অর্থোপার্জন করি। আমি চাই আমার সাথে তোদেরে মিশায়ে রাখতে।

বীর্যপাত বন্ধ করতে হবে, যতটা পার। এইগুলি হারিয়ে তো লাভ নেই। কি আনন্দ পাও? **একটা ছেলের যা আছে ভিতরে, একটা মেয়েরও তাই আছে। কি ভালবাসা তোদের। তবু দেখ, প্রকৃতি তোমাদের উপর ছেড়ে দিয়েছে। ইচ্ছা হইলে তুমি ভাল হইতে পার, ইচ্ছা হইলে তুমি খারাপ হইতে পার। বল, সেটা তোমার হাতে কি না?**

— আজ্ঞে হ্যাঁ।

— সেই কথাটাই মানবে? না, বন্ধুকে বলবে, চল যাই একটু ঘুরে আসি গিয়া। কোনটা চাও? আমার সন্তান আমি বলবোই। বেত মেরে হলেও আমি তোমাদের শেখাব, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার কাছে আছ। বল, আমার কথা শুনবে তো?

— হ্যাঁ বাবা, শুনবো।

— আমিও তোমাদের জন্য অন্তর দিয়া বইসা (বসে) আছি। এইটা (বেত) দেখছো তো? বেত মাইরা (মেরে) সিধা করবো। কত স্নেহ থাকলে বেতটা মারবো, বলতো?

তোমরা 'পারি না' এই কথাটা বলতে পারবে না। তুমি পারো। না হলে কেন বললে পারি না? 'পারি না' কথাটা তো বুঝেশুনেই বলেছ। 'পারি না' যে বলতে পারে, 'পারি' ও সে বলতে পারে। দুটোই তোমার হাতে। সহজভাবে স্বচ্ছভাবে তোমাদের আমি কোলে রেখেছি, অন্তরে রেখেছি। আমি কখনও ফাঁকি দেব না। জীবনে সর্বদা সত্য কথা বলবো। আমার কথা আমি

বলে যাব। **আমি অনন্ত সুরের পথ দিয়ে প্রকৃতির ধারাপাতা ধরে ধরে অনন্ত মহাকাশের যাত্রিক হিসাবে তোমাদের সহ একত্র হয়ে, বাপ-বেটা বেটী একত্র হয়ে তোমাদের নিয়ে যাব সেই সুদূরের দেশে।**

আমি শিশুবয়স থেকেই প্রকৃতির সুর নিয়ে আছি। পাঁচ বছর তিন মাস বয়স থেকে দীক্ষা দিচ্ছি। পাঠশালার মাষ্টার, স্কুলের মাষ্টার মশাইরা ঐ বাচ্চাবয়সেই দীক্ষা নিয়েছে আমার কাছে। গুরুজনস্থানীয় আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সব দীক্ষা নিয়েছে আমার কাছে। ছোটবেলা আমার ছিল ১টা প্যান্ট, ১টা চাদর ও একখানা কাপড়। এতটুকু বাচ্চা আমি। সেদিন ছিল তিনটাই ভিজা। রবিবার দিন, আমি ল্যাংটা হয়ে একটা গাছের উপর বসে আছি। সকালেই শুনি পাঠশালার আনন্দমাষ্টার মশাইয়ের গলা, ''কইও (কোথায়)? আমি দীক্ষা নিতে আসছি।'' হইছে কর্ম। আমি এখন কি করি? আমি বলি (গাছের উপর থেকে), ''আমি আসতে পারুম না। ল্যাংটা হইয়া রইছি।''

— আমার চাদরটা আছে। তোমারে প্যাঁচাইয়া লইয়া আসুম। চাদর পইরা আইসা (এসে) দীক্ষা দিলাম। সে আমারে প্রণাম করে। আমি আবার তারে প্রণাম করি।

— তুমি আমার পরপারের কাণ্ডারী, মাষ্টার মশাই বলেন।

— কাণ্ডারী হই, যাই হই, আপনি তো আমার মাষ্টার মশাই। চাদর দিয়া প্যাঁচাইয়া দিছে। আমি চুপ কইরা (করে) বইসা রইছি।

জীবনের যাত্রাপথে আমি আমার ন্যায়ের পথ থেকে এতটুকু সরে দাঁড়াইনি। নিজের position-এর জন্য কোন চেষ্টা করিনি। আমি position ভিক্ষা করি না। নেতা সাজতে চাই না। আমি মহাকাশের মহা সুর নিয়ে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রারের সুর বাজিয়ে সবাইকে এক সুরে আনার চেষ্টা করছি। আমি (আমার কাছে) প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। প্রকৃতির সুরের সাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করেছি। সেই ধ্বনিতে আনন্দের সুর, বিরাটের সুর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। যতবেশী খাওয়ার ইচ্ছা মনে মনে ততবেশী খাওয়া যাবে। ইচ্ছাটা মনে মনে থাকলেই চলবে। ট্রেনে, ট্রামে, গাড়ীতে যাবার দরকার নাই।

যারা আমার কাছে দীক্ষা নিতে আসতো, তখন তাদের এই কথাই বলতাম, তোমাদের যেন সুরে ভরপুর রাখতে পারি, ন্যায়েতে ভরপুর রাখতে পারি, নিষ্ঠাতে ভরপুর রাখতে পারি। তবে নিশ্চয়ই মহাকাশের যাত্রিক হয়ে সবাইকে নিয়ে যেতে পারবো। তখন আমি চিন্তা করতাম, সবাইকে নিয়ে যাব। কাউকে ফেলে যাব না। বাচ্চাগুলি মাঝে মাঝে দুষ্টামি করতো, বেশী বেশী বোঝে, বেশী বেশী বলে।

তাদের বলেছি, তোমাদের সাথে আমার সহজ সম্পর্ক রাখতে চাইবে। আমি চাইছি, আমার সুরে তোমাদের রাখতে, আমার সুরে ভরপুর করতে। আমি সেটায় সফলতা লাভ করেই যাব। করতে বাধ্য এবং করবো। এইসব বিভ্রান্তিমূলক কথা আমি শুনতে রাজী নই। যে যা বলে বলুক, আমি যাদের কানে মন্ত্র দিয়েছি, এক রক্তের সম্পর্ক করেছি, সেই সুরে আমি যেখানে যাব ঠিক করেছি, আমার বালবাচ্চাদের সবাইরে নিয়ে যাব। কেউ ভুল বুঝবে না। আমার কোন স্বার্থ নাই তোমাদের ভুল বুঝাবার। আমি যেইখানে আছি, সেই সুরেই তোমাদের নেব। মাষ্টার মশাইকে বলেছি, আপনি আমাকে অ আ ক খ শিখাইছেন, আমি দিলাম আপনাকে মহামন্ত্র।

আমার বুকে তোমরা আছ। আমার পেটের বাচ্চা হয়ে আছ। আমি যেন অন্তরঢালা প্রেম ভালবাসা দিয়ে তোমাদের অন্তরে রাখতে পারি। দলাদলি বাদ দিয়ে দাও। যেই দলেই দেখবে, উনিশ বিশ করছে, বাদ দিয়ে দেবে। কোন বাদাবাদির প্রয়োজনীয়তা নাই। **এগুলো সব dead-body. জানো, সব dead-body আমরা। life-টা বেরিয়ে গেলেই পরিষ্কার হয়ে গেল। যত সব dead-body একত্র হচ্ছে; ভুলে যেও না। মৃত্যু যেখানে অনিবার্য, সেখানে কি সম্বল নিয়ে যাবে? তুমি তোমার পাথেয় নিয়ে যাবে।** রাম নারায়ণ রাম। সেইভাবেই কাজ কর।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

আমরা অবুঝ, আমরা অজ্ঞান আমাদের আলোর পথ দেখাও

লেকটাউন

১৬ই অক্টোবর, ১৯৮৬

প্রকৃতির রূপে রূপে প্রকৃতির সুরে সুরে একটা সুর গাঁথা আছে যে, কেউ কারও নয়। এর ভিতর দিয়েই আমাদের জেনে যেতে হবে, বুঝে যেতে হবে। আমাদের শাস্ত্রে লক্ষ্মীপূজা আজ। পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় পূর্ণজ্যোতি নিয়ে মা লক্ষ্মীর আগমন। তার পরক্ষণেই আবার পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ। বলা হয় যে, রাহু গ্রাস করছেন পূর্ণচন্দ্রকে। রাহু নয়। সূর্যের আলো পৃথিবীর গাত্রে যখন পড়ে সেই ছায়াটা কলায় কলায় গিয়ে পূর্ণগ্রাস হয় অমাবস্যায়। অমাবস্যায় পূর্ণগ্রাস হয়। রাহুর গ্রাস নয়। প্রকৃতির নিয়মের গ্রাস। আজ সেই দিন ঘুরে এসেছে পূর্ণিমার চাঁদের। আগেই বলেছি, পৃথিবীর ছায়া গিয়ে পড়ে চাঁদের উপর। সূর্যের আলো গিয়ে যখন পৃথিবীর উপর পড়ে, তার ছায়া চন্দ্রকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে নেয়।

আপনাদের ঘুম নষ্ট করা হচ্ছে কয়েক মিনিটের জন্য। নিয়মের ধারায় বলা আছে, কারও ঘুম, কারও অসুবিধা কেউ করবে না। কিন্তু আবার নিয়মে আছে, যদি দেখ, আপদ বিপদ ঘনিয়ে এসেছে, যতবড় শত্রুই হোক, তাকে জানাও। জানিয়ে দিয়ে যাও। বিপদ আমাদের সম্মুখে। আমাদের সাবধানতার বাণী প্রতি মুহূর্তে ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক প্রতিবেশী বন্ধুদের, ভালবাসার জনদের, পৃথিবীর সবাইকেই জানানো উচিত। কখন কোন্ শুভলগনে কোন মুহূর্ত্তে কার স্পর্শে কোন অনুভূতি এসে আমাদের সাহায্য করবে কে জানে? তবে চাঁদের এই দুর্দশায় পৃথিবীর ছায়া সম্পূর্ণ আজ চাঁদের উপরে।

এই জীবলোকের সকলের শরীর, মন, দেহ একই সুরে গাঁথা। আমাদের কর্ত্তব্য মনে প্রাণে অন্তরে সেই আলোর সাধনা করে আলোর জগতে পৌঁছানোর চেষ্টা করা। চাঁদের স্নিগ্ধ আলোর উপরে যখন ছায়ার বর্ষণ হচ্ছে, চাঁদ মনে হয় যেন সশঙ্কিত, সতর্কিত। সে বলে, ১৫ দিন পরে

যখন পূর্ণ জ্যোতিতে আমি বিকশিত, আজ হঠাৎ কেন আমার উপরে পূর্ণ ষোল কলার ছায়া একেবারে এসে উপনীত হল? আমি তো অমাবস্যা নই। আমি প্রতিপদে আসিনি, দ্বিতীয়ায়ও আসিনি। আজ পূর্ণচন্দ্র, পূর্ণকলা, পূর্ণভাবেই প্রকাশিত। হঠাৎ এসে আমার উপরে পড়লো এক বিরাট চাপ। হে জীবজাতি, হে দেশবাসী, এইরকম চাপ কিন্তু তোমাদের উপরে অহর্নিশ আসছে। **অন্ধকারের চাপ এসে যখন উপস্থিত হয়, তখন প্রত্যেকেরই আলোর সন্ধানে চলে যাওয়া উচিত। আমরা চাই আলো, আলো আলো।**

তাই আপনাদের ঘুমের অসুবিধা সত্ত্বেও আমি বন্ধুভাবে, ভালবাসার জন হিসাবে আপনাদের শান্তির ঘুমটুকুনু নষ্ট করে সবাইকে জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছি এই প্রকৃতির রহস্য। কেউ আমাকে ভালবাসুক বা না বাসুক, তাতে কিছু আসে যায় না। এই সময়টুকুনুতে নিশ্চয়ই একটু কীর্তন শুনতে পেয়েছেন। স্বচ্ছপবিত্রভাবে যদি একটু নামগান করা যায়, পবিত্রসুরে যদি নিজেকে উৎসর্গ করা যায় এই শুভক্ষণে, তবে নিশ্চয়ই সূর্যের আলোকে যেমন আলোকিত চাঁদ, আমরাও তাঁর আলোকে আলোকিত হয়ে প্রার্থনা করবো, আমাদের ভিতরের অন্ধকার ছায়া যেন দূর হয়। এইদিকে সম্পূর্ণভাবে যেন দৃষ্টিনিক্ষেপ করা হয়, তারজন্যই হচ্ছে আরাধনা। কি আছে, কি নাই, কেউ জানে না। শাস্ত্রে মন্ত্রে গণিতে যে বিধিব্যবস্থা আছে, সেগুলি প্রত্যেকেরই স্মরণ করা উচিত।

ঘুম জীবনের শেষ নয়, সমাপ্তি নয়। ঘুম হচ্ছে মৃত্যুর ইঙ্গিত। এই মৃত্যুর ইঙ্গিত ঘুম কখন মৃত্যুতে পৌঁছে? প্রকৃতির নিয়মে প্রতিদিনের একটু ঘুম, আরেকটু ঘুম, আরেকটু ঘুম এইভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরে পর বছর ঘুমাতে ঘুমাতে যখন শেষ ঘুমে দাঁড়িয়ে যায়, সেই ঘুম হতে আর কেউ জাগে না। কিন্তু প্রতিদিনই আমরা মৃত্যুর সাথে সাক্ষাৎ করছি কয়েক ঘণ্টার জন্য। সেই ঘণ্টাগুলো, মিনিটগুলো একত্রিত হয়ে যখন এক সুরের বন্ধনে থাকবে, সেদিন দেখবে চির নিদ্রায় আমাদের অভিভূত করে দেবে। বিভোর করে দেবে। তখন আর কেউ জাগবে না। তখন শত অসুবিধা করলেও কিন্তু ক্ষমার চক্ষেই দেখবে। আজ না হয় অসুবিধা করলে আপনারা চটবেন, পুলিশে খবর দেবেন, বলবেন, 'আমাদের অসুবিধা হচ্ছে'।

বুঝি, বুঝি। তবু বন্ধু হিসাবে আমার কর্ত্তব্য হিসাবে আমি জানাবো এই

শুভদিনে শুভক্ষণে। প্রতিদিনই দিনক্ষণ চলছে, ঘুরে ঘুরে আসছে। এই ৫০০/৬০০ কোটি বছর পৃথিবীর বয়স চলে যাচ্ছে। আমাদের পূর্বপুরুষ যারা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জনম ভুগছিল, সব চলে গেছে। তাদের স্মৃতিটুকুনু নিয়ে আমরা চলছি। ভুলে যাবেন না, মৃত্যুর হাত থেকে কেউ রেহাই পাবেন না। আমাদের যত বড়াই, যত অভিমান, যত অহঙ্কার, যত দাম্ভিকতা সব এইটুকুনু সময়ের মধ্যে। কিন্তু আমরা সমুদ্রের উপরে জাহাজে আছি। কখন জাহাজ ডুবে যাবে, বলা যায় না। তাই শুভমুহূর্ত্তে আপনাদের অসুবিধা সত্ত্বেও চলার পথের পথিক হিসাবে যাত্রিক হিসাবে আমি জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছি, শাস্ত্রের মহাবাণী, বেদের মহাবাণী। বেদমন্ত্র .....।

এই গ্রাস, পূর্ণচন্দ্র আজ গ্রাসের মুখে পড়ে গেছে। ছায়ার গ্রাস। এমন স্নিগ্ধ পূর্ণ জ্যোতির্ময় চাঁদকে আজ গ্রাস করছে পৃথিবীর ছায়া। গ্রাস করছে? না, কোলে টেনে নিয়ে আসতে চাইছে। কোনটা? কিন্তু আলোই তার প্রধান। **আলো না থাকলে ছায়া হয় না। তাই সূর্য আমাদের জীবনে প্রতিক্ষণে সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা করছেন। আপনারা সেই চিন্তায় সূর্যমুখী ফুল হয়ে সেই সাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করুন। চাঁদের নিজের আলো কতটুকু? আছে কি নেই। কিন্তু সূর্যের আলোকে সে আলোকিত। কি অদ্ভুত? কি রহস্য। কি তাঁর লীলা। বুঝা বড় দায়।** আপনাদের বলছি না, ভগবান আছেন কি নেই। কিন্তু প্রকৃতির রহস্য, প্রকৃতির তিথি গণনা, ইহা যে অঙ্কে সত্য। তাই আপনাদের কাছে, পাড়াপড়শীদের কাছে, পৃথিবীর নগরবাসীদের কাছে এটাই আমার আবেদন, তারা যেন অঙ্কে ভুল না করে। এটাই আমার পৃথিবীর গণিত, এটাই আমার পৃথিবীর অঙ্ক।

ঘুরে ঘুরে আসছে বছরের পর বছর। চিন্তা করুন কারও বাবা নাই, কারও মা নাই। কারও ছেলে নাই, কারও স্ত্রী নাই, কন্যা নাই। এই নাই নাই হাহাকারের প্রতিবাদ করে পুলিশের কাছে রিপোর্ট দিলে কোন সন্তান, কোন ছেলেপিলে, কোন বাপ-মা মিলে না। আমাদের বেঁচে থাকার সময়টুকুনুতে যতখুশী প্রতিবাদ করতে পারেন, নির্যাতন করতে পারেন পাড়া প্রতিবেশীরা। কিন্তু নির্যাতনের ভয়ে চুপ করে থাকবো, ভুল অঙ্ক সংশোধন করবো না। তাতো হতে পারে না। আপনাদের যদি দেখি, শাস্ত্র বিরোধিতার কাজ, আপনাদের যদি দেখি প্রকৃতির বিরোধিতার কাজ, সেখানে সবাই মিলে

সেই অঙ্ক সংশোধন করে আমরা যেন সত্যের সাধনায় নিজেদের উৎসর্গ করতে পারি, এটাই হবে একমাত্র বন্ধুত্বের, আন্তরিকতার পরিচয়।

তাই এই শুভলগনে পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণে আপনারা প্রত্যেকে নিজ নিজ মনে প্রাণে অন্তরে চন্দ্রের কাছে, সূর্যের কাছে, গ্রহনক্ষত্রের কাছে, বসুমতীর কাছে আবেদন করুন। এঁদের থেকে জন্ম মোদের, এঁরাই আমাদের পূর্বপুরুষ। তাই তাঁদের কাছে আবেদন করুন, নিবেদন করুন, আমরা যেন সত্য ন্যায় নিষ্ঠাভরে কাজ করতে পারি। আমরা যেন সত্যভ্রষ্ট না হই। আমাদের জীবনযাত্রার পথে সব জীবজাতি, সব মানবজাতি যেন এক সুরের বন্ধনে থাকতে পারি। তবেই হবে আমাদের সাধনার সার্থকতা। আপনাদের একটু বিরক্ত করলাম। জানি আপনারা অসন্তুষ্ট হতে পারেন আমার উপরে। আমি আপনাদের উপরে অসন্তুষ্ট নই। আপনাদের উপরে কোন শত্রুতা সাধনের চিন্তা আমার নেই। মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে আসছে। সূর্য অস্তগামী। আমরা তো চলে যাব। গ্রামদেশের চৌকিদাররা যেমন হাঁক দেয়, বস্তিওয়ালা খবরদার, বস্তিওয়ালা খবরদার, জাগো, জাগো, জাগো। বস্তিওয়ালা খবরদার জাগো। তাই আপনাদের বলছি, আমাদের সবাইকে বলছি, জাগো জাগো। দুর্নীতিকারীরা আক্রমণকারীরা কিন্তু ঘুরছে চারিদিকে। তাই, **বেহুঁশভাবে চললে পরে তহবিলের মাল যাবে চুরি। আগে যেয়ে জেনে নেওরে দেবতাদের কাছে শাস্ত্রের কাছে, গুরুর কাছে দোকানদারী।**

সেই মহানাম হরেকৃষ্ণ হরেরাম দিয়ে গিয়েছিলেন মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব। মহাকাশের মহানাম মহাস্বরগ্রাম, আরেক মহানাম রাম নারায়ণ রাম। ঘরে ঘরে নাম, পাড়ায় পাড়ায় নাম, নগরে নগরে নাম। এই শুভলগনেও নাম হচ্ছে। আর ৩ ঘণ্টার মধ্যেই ছেড়ে দেবে। লাগাতে আর ছাড়াতে, শুরুতে আর সমাপ্তিতে— এই দুইয়ের মাঝে আমরা একত্রিত হতে চাই। চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী একভাবে রয়েছে। সুতরাং তারা একমাত্রায় থেকে আমাদের মাত্রাজ্ঞান শিখাচ্ছে। হে দেবতা, আমাদের মাত্রাজ্ঞান শিখাও। হে বিশ্বের সুর, হে প্রকৃতি, আমাদের মাত্রাজ্ঞান দাও। আমাদের বুদ্ধি দাও। আমাদের বিবেচনা দাও। আমরা যেন গণিতের মাত্রা লক্ষ্য করে, সুরের মাত্রা লক্ষ্য করে চলতে পারি। আমরা যেন সবদেশের ভাইবোনদের নিয়ে এক একান্নভুক্ত পরিবারের মতো সবাই চলে যেতে পারি। কারও কিছু দাম্ভিকতা

থাকবে না, যৌবন থাকবে না। কিছুই থাকবে না। থাকবে একমাত্র ন্যায়, নিষ্ঠা, সত্য। মান অভিমান আপনারা ভুলে যান। সমস্ত দাম্ভিকতা ভুলে যান। আসুন আমরা একই আলো বাতাসে চন্দ্রে সূর্যে জলে মাটিতে মানুষ। আমরা একমাত্রায় থেকে সৎ চিন্তা, সদ্ব্যবহার নিয়ে একত্রই যেন চলতে পারি, এই কামনা করুন। রাম নারায়ণ রাম। রাম নারায়ণ রাম। রাম নারায়ণ রাম।

একটু অসুবিধা করলাম। মনে কিছু করবেন না। যা করলাম, কর্ত্তব্যবোধে করা হল। বেদবাণীতে আছে, তুমি জানাও, তোমরা জানাও। তোমরা সত্যকে জানাও। কেউ যদি তোমাদের বকে, কেউ যদি তোমাদের গালি দেয়, কেউ যদি তোমাদের সম্বন্ধে অযথা রিপোর্ট দেয়, তোমরা আর্শীবাদ বলে মনে করিও। রাম নারায়ণ রাম।

আপনাদের কাছে এইটুকুনু বলে শেষ করছি। আপনারা মনে কিছু করবেন না। ঘুমের সময় এর চেয়ে অনেক বেশী নষ্ট হয়। তাস খেলে, জুয়া খেলে, আজেবাজে কাজ করে অনেকে অনেক সময় নষ্ট করে। যে কথাগুলো বলে আপনাদের কিছুটা সময় নষ্ট করলাম, অন্তরের তাগিদেই বললাম। আপনারা মনে কিছু করবেন না। কারণ আমি বলতে বাধ্য। আমার রক্ত মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের রক্ত। এই রক্ত মান অপমান সহ্য করবে। এই রক্তে নির্যাতন সহ্য করাই হল, তার বিধি নিয়ম। আমি গৌরের রক্ত হিসাবে মাথা পেতে সব সহ্য করবো। আসুন, এখনও আসুন। এই বিশ্বের প্ল্যাটফর্মে আমরা সবাই একত্রিত হয়ে কাজ করি। টিকিট তো সবারই কাটা হয়ে গেছে। কার কখন ডাক পড়ে ঠিক নাই।

গ্রহণের সময় একটু নাম করুন। একটু চিন্তা করুন। শুভ চিন্তা করুন। দেবতাকে ডাকুন বা না ডাকুন, শুভ প্রকৃতির কাছে নিজেকে উৎসর্গ করে সেই কথাই বলুন, আমাকে জানাও, আমাকে বুঝাও কি করতে হবে। হে প্রকৃতি, হে প্রকৃতির সুর, হে চন্দ্র সূর্য কে কোথায় আছ, আমাদের বুঝাও। আমরা অবুঝ, আমরা অজ্ঞান আমাদের আলোতে নিয়ে যাও। রাম নারায়ণ রাম।

আপনারা এখন শান্তিভাবে ঘুমাতে পারবেন। যেটুকুনু সময় নষ্ট করলাম, ভোরবেলা না হয় একটু দেরীতে উঠবেন।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

পূর্ব আকাশে লাল
সেই মহাশক্তির ইঙ্গিত
আমি প্রতিমুহূর্ত্তে উপলব্ধি করছি

বর্দ্ধমান, টাউন হল ময়দান,
১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

২২শে ডিসেম্বর প্রোগ্রামে বেরিয়ে বাঁকুড়া গেছি। বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে মিটিং করছি। ভীষণ ক্লান্ত। গ্রামে গ্রামাঞ্চলে শহরে হাজার হাজার লোক দীক্ষা নিয়েছে। কী উন্মাদনা দেখে এলাম। প্রায় ২৫ হাজারের উপর মানুষকে দীক্ষা দিয়েছি। **মানুষের মাঝে যে ধর্মবোধ নেই, একথা বলা চলে না। ধর্মের আসল তত্ত্ব খুঁজে পেলে সবাই পাগল হয়ে যায়। শিশু যেমন মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে মধুপান করে, ঠিক তেমনি মধুর মিষ্টত্ব আস্বাদন করার মত অদ্ভুত উন্মাদনায় তারা চলে আসছে।** না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না, কেমন করে হাজার হাজার লোক ছুটে আসছে গ্রাম থেকে, শহর থেকে। কী পেতে চায় তারা? এক শান্তির সুর, এক মহাশান্তির পিছনে সবাই ধাইছে। কিন্তু শান্তির সুর, শান্তির বাণী কেউ দিচ্ছে না। শান্তির বাণী দিতে গেলে যে মন থাকা দরকার, সেই মনও আজ নেই।

সেই ২২ তারিখ (ডিসেম্বর, ১৯৭৫) থেকে শুরু করেছি। কাল দুর্গাপুরে এসেছি। সেখানেও সাংঘাতিক অবস্থা। 'বাবা, যাওয়ার পথে একটু এসো।' আমি বলেছি, নিশ্চয়ই যাব। কোন প্রস্তুতি নাই, কেউ জানলো না। অসুস্থ শরীর গলা ধরে গেছে। আমি আমার সন্তানদের কাছে এসেছি। আমার ভাল লাগলো। তোমাদের আশীর্বাদ করছি। তোমরা যে আকুল আগ্রহে ছুটে এসেছ আমার কাছে, যেই বেদপ্রচারে নেমেছ, বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে অগ্রসর হয়ে যাও। কারণ ধর্মের দিক থেকে বলতে গেলে এই বেদ, বেদের সুরই একমাত্র থাকবে। তাই বেদপ্রচার কর। বেদের সুর, বেদনীতি—

রাজনীতি নয়। সম্পূর্ণ প্রেম, ভালবাসা, ভক্তির দ্বারা সমাজকে সুন্দর কর, সমাজকে সুন্দরভাবে ভরিয়ে তোল, গড়ে তোল। নিশ্চয়ই এর থেকে সুফল খুঁজে পাবে। **এখানে দলাদলি নাই, ঝগড়া নাই, সাম্প্রদায়িকতা নাই, কোন সাংগঠনিক মারামারি নাই। আছে শুধু প্রেম আর ভালবাসা। এই ভালবাসায় তৈরী করতে হবে আমাদের আদিযুগের আদিবেদের আদিসুর।** বেদের যুগে দেবতারা সব বেদপ্রচার করে গেছেন। শিব, পার্বতী, কৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র এবং সমস্ত দেবদেবীরা সমাজকে এক শৃঙ্খলায় এনে সুন্দরভাবে গড়তে চেয়েছিলেন। তারপর সেই বেদপ্রচারের ধারা ধরে এলেন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু দ্বারে দ্বারে নামপ্রচার করতে আরম্ভ করলেন। বেদপ্রচার শুরু করলেন। তিনি সমাজের সবাইকে বেদের সুরে আনার চেষ্টা করলেন। বেদ আজ মুক্ত হতে চাইছে। বেদের অর্থ বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। তাই সমাজে ধর্মের নামে ব্যবসা চলছে। গুরুশিষ্যের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে যাচ্ছে। বেশীরভাগ গুরুরা হয়ে যাচ্ছে সমাজের পরগাছাস্বরূপ। তারা শিষ্যের মাথায় হাত বুলিয়ে সমাজে রক্তশোষণ করবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই আমি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে যাচ্ছি। সমাজে গুরুগিরির নাম ভাঙিয়ে, মহানের নাম ভাঙিয়ে নিরীহ সন্তানদের, ছেলেমেয়েদের যাতে শুষতে না পারে, তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি। **কত আঘাত, প্রত্যাঘাত, অপমান, লাঞ্ছনা সব কিছু সহ্য করে, শত অপবাদ, সুনাম দুর্নাম কাঁধে নিয়ে আমার তরী ভাসিয়ে দিয়েছি এই ঝড়ের বিরুদ্ধে।** মহাপ্রভু নানা অপমান, লাঞ্ছনা সহ্য করেছিলেন, অসুরদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছিলেন। শেষবেলা তাঁকে মেরে সাগরের জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। তিনি চির অমরত্বের সুর নিয়ে এসেছিলেন। তাই আজও তিনি চির-অমলিন।

মহাপ্রভু চেয়েছিলেন বেদভিত্তিক সমাজব্যবস্থা। সেই সমাজে কোন অভাব থাকবে না, কলহ থাকবে না, বিবাদ বিচ্ছেদ থাকবে না। তাঁর সেই ইচ্ছা যাতে পূরণ হয়, সেই ব্যবস্থা আমাদের সবারই করা উচিত। তাঁর উদ্দেশ্য সফল করার জন্য, তাঁর ইচ্ছা পরিপূরণের জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করছি। কেন তাঁর ইচ্ছা আমি পূরণ করতে এসেছি? সেই কথাটি আগে বলা দরকার। এদিক থেকে আমি মহা আনন্দিত। এটাই আমার গৌরব। মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে আমি তাঁর শেষ রক্ত। এজন্যই মনে হয়, সব ঝড়-ঝাপটা

সহ্য করতে পারছি। মহাপ্রভুর রক্তের যাতে অমর্যাদা না হয়, তাঁর রক্তের মর্যাদা যাতে দিতে পারি, তার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি। তিনি অকাতরে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে কোল দিয়ে গেছেন। আজ এই যে, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ, কয়েক কোটির কাছাকাছি সন্তান হয়েছে আমার, দীক্ষা দিয়ে সবাইকে এক সূত্রে গেঁথে নিচ্ছি। এখানে দীক্ষা নিতে টাকা লাগে না, পয়সা লাগে না, কড়ি লাগে না, বস্ত্র লাগে না। দিন, ক্ষণ, সময় কিছুই লাগে না। মার খেয়ে নাম যাচে গৌর নিত্যানন্দ। পথে ঘাটে নাম যাচে গৌর নিত্যানন্দ। ধনী কাঙাল বাছে নারে গৌর নিত্যানন্দ।।

জন্ম, মৃত্যু ও দীক্ষার কোন সময় নাই। ফুল চন্দনে পুজো করে কোন বাবা মা আমাদের জন্ম দেননি। হঠাৎ হঠাৎই সবার জন্ম। তেমনি হঠাৎ হঠাৎ প্রস্তুতি বিহীন যে দীক্ষা নেওয়া, মন্ত্র নেওয়া, সেটাই হল সবচেয়ে বড় দীক্ষা। তাই হাজার হাজার লোক লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে, আমি সরিষা ছিটানোর মত দীক্ষা দিয়ে যাচ্ছি। তাতেই মনে হয়, ভারতের বুকে সুফল ফলবে। নদীগুলো একদিন অকেজো হয়ে পড়েছিল। পাঁচবছর আগে দেখে এসেছিলাম, জল নেই। আজ জলের ব্যবস্থায় সুফল ফলতে শুরু করেছে। এমনি করে যদি সবদিকে জলের ব্যবস্থা হয়ে যায়, বাংলা ভারতে আর কোন অভাব থাকবে না। ডালা ভরে সরিষা নিয়ে যদি একটি একটি করে পুঁততে থাকে, তবে যে পুঁততে যাবে, তার পিছনে গাছ গজিয়ে যাবে, ডালার সরিষা শেষ হবে না। তাই ছিটিয়ে ছিটিয়ে সরিষা পুঁততে হয়। আমি আপনমনে সরিষা ছিটানোর মত দীক্ষা দিয়ে যাচ্ছি। আগেই বলেছি, দীক্ষা নিতে কোন টাকা পয়সা লাগে না। বাবা যখন আমাকে জন্ম দিয়েছেন, তিনি কি আমার কাছে টাকা চেয়েছেন? জন্ম দিয়ে বাবা যদি টাকা দিতে বলেন, তাহলে আর বলার কিছু নাই। **জন্ম দিয়ে বাবা যদি টাকা চান, এটা শুনতে যেমন খারাপ; দীক্ষা দিয়ে টাকা নেওয়াটাও তেমনি অসামঞ্জস্যপূর্ণ। বাপ-বেটার সম্পর্ক, দরকার হলে চেয়ে নেব। দীক্ষা নিয়ে দক্ষিণা? মন-দক্ষিণা ছাড়া অন্য কোন দক্ষিণা হতে পারে না। যারা এমন করছে, আশ্রমের জন্য টাকা, হ্যানে টাকা, ত্যানে টাকা ব্যাবসায়িক বুদ্ধিতে করছে। এইসব টাকা-পয়সা নেওয়ার ব্যবস্থা ধর্মে নাই।** আশ্রম বলে আলাদা কোন ব্যবস্থা নাই। বেদে আলাদা কোন আশ্রমের কথা নাই। সমস্ত জগৎটাই হল আশ্রম। বেদে

আলাদা কোন সন্ন্যাসের কথা নাই। জন্মই সন্ন্যাস। মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিতে গিয়েছিলেন কেন? মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিতে যাননি। তিনি বেশ ধারণ করেছিলেন। তিনি বেশ ধারণ করে সবার মাঝে নাম বিতরণ করতে গিয়েছিলেন। সবাইকে বলেছিলেন, 'আয়রে তোরা আয়।' মাকে কাঁদিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেননি তিনি। সবাই বলে মহাপ্রভুর ঘটনা। আমি বলছি, আমার মাতুলালয়ের ঘটনা। নবদ্বীপবাসী অবশ্য জানে। মহাপ্রভুর মা ছিলেন শচীদেবী। শচীদেবীর বাবা হলেন নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর ছেলে হলেন বিষ্ণুদাস চক্রবর্ত্তী, গৌরাঙ্গদেবের আপন মামা, শচীদেবীর ভাই। মহাপ্রভু মামা বিষ্ণুদাস চক্রবর্ত্তীর কাছে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তিনি তাঁর বংশে ত্রয়োদশ উত্তরপুরুষে ভাগিনেয়রূপে অবতীর্ণ হবেন। মহাপ্রভুর এই ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বিষ্ণুদাস চক্রবর্ত্তীর জামাতা পণ্ডিত গৌপীনাথ কণ্ঠাভরণ তাঁর নাগার্জুন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। বিষ্ণুদাস চক্রবর্ত্তীর একাদশ উত্তরপুরুষ হলেন অম্বিকানাথ বিদ্যাভূষণ। তাঁর কন্যা চারুশীলা দেবী হলেন আমার মা। মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে তাঁর রক্ত আমি বহন করছি। এ আমার অহঙ্কারের কথা নয়; এ আমার গৌরব। মহাপ্রভুর শেষ রক্ত নিয়ে আজ সমাজের বুকে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। সবাইকে এক করার উদ্দেশ্যে শত বদনাম, ঝড়-ঝাপ্টা, আঘাত নিয়ে এগিয়ে চলেছি বাংলা ভারতের বুকে। মহাপ্রভুর রক্ত যখন আছে, নিশ্চয়ই পারবো। তোমাদের পূর্বপুরুষরা মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিল, আজ তাঁদের রক্তের সন্তান তোমরা। আজ আমিও তাঁর রক্তের সন্তান। আবার আসবে সেই বেদের যুগ। আবার আসবে সেই বেদভিত্তিক সমাজ। কেন পারবো না? কেন হবে না? আমার সেই মনোবল আছে। **আমি কখনও হতাশ, নিরাশ হইনি। হতাশা, নিরাশা, ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে আমি রাস্তা তৈরী করেছি; অপবাদ, অপপ্রচারকে বাহন করে এগিয়ে চলেছি।** বেদ কাউকে অবহেলা করেনি।

আজ হাজার হাজার শিশু না খেয়ে পড়ে আছে। লাঞ্ছিত, অবহেলিত হয়ে ধুলায় গড়াচ্ছে। তাদের শিক্ষা-দীক্ষার কোন গন্ধ নাই। আমি তাদের কোল দিয়েছি। **সবাইকে বলেছি, "তোরা আয় বাবা; বেদের সুরে গান ধর। রাম নারায়ণ রাম গান কর। নিশ্চয়ই তোদের সুর খুঁজে পাবি। বৃষ্টির জলের মত সব ধুয়ে মুছে যাবে। তোরা অশান্তিতে আর দিন কাটাবি না।" সময়**

ঘনিয়ে আসছে। পূর্ব আকাশে লাল। সেই মহাশক্তির ইঙ্গিত আমি প্রতিমুহূর্ত্তে উপলব্ধি করছি। আসছে সেই বেদের সুর, বেদের যুগ। অভাবে আর দিন কাটাতে হবে না। বেদ সমাজকে অভাব থেকে, ঝড়-ঝাপটা থেকে মুক্ত করেছেন। বেদ সমাজকে ক্লেদমুক্ত করেছেন, সমাজকে সবদিক থেকে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করে গড়ে তুলেছেন। **তাই বেদের সন্তান তোমরা, সব বিবাদ-বিচ্ছেদ ভুলে এক হয়ে যাও। দলাদলি ভুলে এক হয়ে যাও। একটা মালার মাঝে একটা ফুল এতটুকুনু। কিন্তু হাজার হাজার ফুল যদি একত্রিত হয়ে যায়, তবে কত সুন্দর মালা গাঁথা যায় বলতো?'** কর্মীরা সব এক হয়ে যাও। এক সুরে সবাইকে বাঁধ। হাজার হাজার ভাইবোনেরা একত্রিত হয়ে সমাজকে সুন্দর কর। সমাজ নিশ্চয়ই সুন্দর হবে। তারজন্যই সন্তান। এই সন্তানরাই তখন বেদপ্রচার করতো। এই সন্তানদল বেদপ্রচারের জন্য। এটা রাজনীতির দল নয়, দল হিসাবে দল নয়। 'সন্তানদল' অর্থ সন্তানগণ। অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, সাম্প্রদায়িকতা নয়। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে জগতের সব সন্তান নিয়েই এই সন্তানদল। আমি আমার সন্তানদের মাধ্যমেই করতে চাই বেদপ্রচার।

আসার পথে হাজার হাজার সন্তান— তাদের কান্নাকাটি, চিৎকার; কি যে অদ্ভুত, ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। সব রাস্তায় পড়ে আছে, কান্নাকাটি করছে। আমি বলেছি, আবার আসবো তোদের কাছে। তাই বর্দ্ধমানের ভাইবোনেদের কাছে আমার অনুরোধ— তোমরা বেদ প্রচার কর, বেদের সুর জাগিয়ে তোল। আমরা রাজনীতিতে নাই, কোন নীতির বিরুদ্ধে আমরা নাই। সব নীতিকেই আমরা ভালবাসি। সবার সাথে এক হয়ে আমরা কাজ করতে চাই। সেইভাবেই সকলের সাহায্য সহযোগিতা ও প্রেম ভালাবাসা নিয়েই আমরা এগিয়ে যেতে চাই। বেদের ভিতরে যাহা আছে, বেদের তত্ত্বে যাহা আছে, তার মর্মার্থ সকলের সামনে তুলে ধরতে চাই। আমি ভাষণ দিতে চাই না। সামান্য কয়েকটি কথা তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম। সব কথা সব সময় বলা যায় না। সুন্দর একটা পরিবেশ সমাজের বুকে গড়ে তোলার জন্য যা যা প্রয়োজন, সব বলা দরকার। সেটা আমি এখন বলতে চাই না। আমি বলতে চাই, ধর্ম যেন বিকৃত না হয়, ধর্মকে নিয়ে যেন ব্যবসা না হয়। কতগুলো so-called (তথাকথিত) সাধু-সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে গেছে, যারা

সমাজকে বিভ্রান্ত করছে। তারা যেন সেটা করতে না পারে, সেদিকে নজর রাখতে হবে। আজ থেকে ৫০০ বছর আগে মহাপ্রভু যেভাবে ১৬ নাম ৩২ অক্ষর হরেকৃষ্ণ হরেরাম দিয়ে গেছেন সমাজের বুকে, তারই নিংড়ানো রস, নিংড়ানো সুর 'রাম নারায়ণ রাম'। মহাকাশের মহাসুরের মহানির্গত মহানিষিক্ত সেই বাণী, মুক্তাকাশের মুক্তবাণী, মুক্তসুর— সেই ধারার ধারা যাকে বলে রাধা, যাকে বলে কৃষ্ণ সেই মহাকাশ; আকাশে নিংড়ানো সুর রাম নারায়ণ রাম। তাই হরেকৃষ্ণ হরেরাম বলো সবে রাম নারায়ণ রাম। **এই মহানাম উচ্চারণ করলে মুক্তি হয়ে যায়। শিব নিজ হস্তে লিখেছেন, রাম নারায়ণ রাম। রা-মুক্ত আকাশের মুক্তবাণী। সেই গায়ত্রী বললেন, মহাকাশের সারকথা, সারমর্ম, বিজ্ঞানসম্মত অর্থ রাম নারায়ণ রাম। শিব বলেছেন, এই মহানাম উচ্চারণ করলে শান্তি অনিবার্য। তাই তোমরা উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করবে রাম নারায়ণ রাম। আর কানে যে বীজমন্ত্র দিয়েছি, মনে মনে জপ করবে।** এ যেন ধান আর চাল। বীজমন্ত্র হচ্ছে ধান। আর চাল হচ্ছে রাম নারায়ণ রাম। তাই দীক্ষা নেবে— সময় আর নেই।

আগে কোন গুরুর কাছে দীক্ষা নিলেও দীক্ষা নেওয়া যায়। ছেলেমেয়েরা পাঠশালা থেকে স্কুলে আসে, স্কুল থেকে কলেজে আসে, কলেজ থেকে ইউনিভার্সিটিতে আসে। আগের মাষ্টার কখনও ত্যাগ হয় না। ঠিক তেমনই দীক্ষা কখনও ত্যাগ হয় না। আগের মন্ত্র ১৮ বার জপ করে নিলেই হয়। আজ আর কিছু বলবো না। সময় আর নেই। তোমরা কাজ করে যাও। আস্তে, আস্তে। তোমরা চুপ করে থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

অন্ধকারে ঘেরা জীবন আমাদের প্রতিমুহূর্ত্তে অন্ধকারের জালে আমরা আবদ্ধ হয়ে আছি

১৫৫, পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১৭
২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

লোক তো সব চলে গেছে। ক্লাস করেছি, জানলে ওদের মনে কষ্ট হবে। ক্লাস হবে না। দু'চারটি কথা বলে শেষ করে দেবো। বছর ঘুরে এল। প্রকৃতির সুরে নিয়মের আবর্তনে দিন মাস বছর কেমন ঘুরে ঘুরে আসছে। এমনি করে একদিন সমস্ত বিশ্ব জগৎ এক সুরের বাঁধনে বাঁধা ছিল। তার যে রং, তার যে বর্ণ সেখানে কোন ভেজাল ছিল না। এখন রং-এ আবিরে এত ভেজাল হয়ে গেছে যে, বলার কিছু নাই। সমস্ত জীবজগৎকে এক বর্ণে করার জন্য ঋষিরা, মহানরা, বেদজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞরা যেভাবে চেষ্টা করে আসছেন, তুলনা হয় না।

বেদ বলছেন, সমস্ত জীবজাতি যেন এক বর্ণে, এক সুরে, এক বাঁধনে থাকে এবং পূর্ণিমার দিনে ষোল কলায় পূর্ণ হয়ে পূর্ণ চন্দ্রের মত বিকশিত হয়। **প্রতিটি জীব অন্ধকারকে অপসারিত করে এক এক কলা পূর্ণ করে পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় যেন প্রস্ফুটিত হয়। যেই অন্ধকার, অজ্ঞানতা আমাদের মধ্যে বিরাজ করছে, তা যেন দূর হয়। প্রতিপদ, দ্বিতীয়া করে করে, পূর্ণিমাতে যেন জ্ঞানের আলো বিকশিত হয়ে পূর্ণচন্দ্রে এসে পৌঁছায়। অন্ধকারে ঘেরা জীবন আমাদের, প্রতিমুহূর্ত্তে অন্ধকারের জালে আমরা আবদ্ধ হয়ে আছি।** প্রকৃতির মাঝে সর্বত্র পাই অভেদের কথা, সেখানে কোন বিভেদের কথা নেই। এক আকাশের তলে সর্ব জীবজগৎ রয়েছে। এক সুরের বাঁধুনিতে এক বাতাস, এক আলোর সাথে সবাই এক হয়ে আছে। এই যে এক আত্মা বোধ, এই একাত্মবোধে যাতে সবাই আসে ঋষিরা, মহানরা তারই চেষ্টা করেছেন।

নানা অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে জীবজগৎকে এক সুরে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। আজ চারিদিকে বর্ণের বিভাগ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সমস্ত দিক থেকে বর্ণে, রং-এ, সুরে বিচ্ছেদেরই সুর সর্বত্র বয়ে চলেছে। এক সুরে আনার প্রচেষ্টা কোথায়? এক সুর তো খুঁজেই পাওয়া যায় না। বেসুরটাই যেন ভালভাবে চলছে। কিন্তু বেসুরে যাতে না যায়, এক সুরে যাতে সবাই থাকে, তাই জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এক বর্ণবোধে, যেই বর্ণবোধে আজ জীবজগৎ রয়েছে, সেই বর্ণবোধ যাতে সবার বোধে আসে, সকলের বোধগম্য হয়, তারই জন্য আজকের এই অনুষ্ঠান। জীবের রক্ত যখন সবার এক লাল; জীবের চৈতন্যবোধ যখন সবার এক; আকাশ বাতাস সব এক, তবে বিবাদ কোথায়? বর্ণ? এক বর্ণবোধেরই বর্ণনা আছে মহাকাশে। বর্ণ সবার এক, রং সবার এক, তবে কেন এত বিবাদ বিচ্ছেদ? জাতিতে জাতিতে প্রেম নেই, মিলন নেই। যা করার দরকার করে যাচ্ছে, তারপর মুখ বন্ধ। যেই শিক্ষা, যার জন্য অনুষ্ঠান সেটাই কাজে লাগছে না। তখনকার দিনের ঋষিরা, বেদজ্ঞরা প্রত্যেকের রং-এর সাথে রং মিলতি করে এক এক উৎসবের আয়োজন করতেন। সেই রং-এ আনন্দ ছিল, প্রেম-প্রীতির বন্ধন ছিল। ছিল শিক্ষা, দীক্ষা; ছিল একত্ববোধ যাতে একান্নভুক্ত পরিবারের মত সব ছিল। সেই উৎসবে ছিল রং-এর খেলা।

যারা রং তৈরী করে নিয়ে আসতো, যারা রং বিক্রী করতো, যারা রং দান করতো সেই উৎসবে, তারা কোথা হতে সেই রং পেল? কেমন করে পেয়েছে? সেই রং পেয়েছে সর্বজাতির রক্ত বিন্দু হতে। এক বিরাট পাত্র, সেখানে দিনের পর দিন সমস্ত দেশবাসী এসে ফোঁটা ফোঁটা করে রক্ত দান করতো। তারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যেতো। তারপর সেই বিরাট পাত্র হতে রক্ত নিয়ে টিনের পর টিন, শতেক টিন সাজিয়ে রাখা হতো। তারা বলতো, "আমরা এক রক্তের গোষ্ঠী; এক রক্তে লাল হয়ে রয়েছি। সুতরাং আমাদের রক্তের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে।" এক ফোঁটার, এক বিন্দুর দাম নেই। কিন্তু দাম নেই বললে তো চলবে না। শত শত বিন্দুতে শতেক টিন ভরে রয়েছে। তুমি না দাও, ক্ষতি নেই। এরকম অজস্র বিন্দু, লক্ষ লক্ষ বিন্দু নিয়ে টিনের পর টিন সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সব ভরে গেছে। সবাই তাকিয়ে আছে, 'আমরা এক রক্তের গোষ্ঠী', তা হ'তে রক্ত নিয়ে সবাই কপালে ফোঁটা দিয়েছে। সুতরাং এ জায়গায় আমাদের বৈষম্য কোথায়? বিবাদ কোথায়?

সবাই রক্তের টিপ, রক্তের ফোঁটা পরা, সবাই রক্ত মাখা। সেই রক্ত কি ইঙ্গিত দিচ্ছে?

ইঙ্গিত দিচ্ছে, তোমরা এক গোষ্ঠী। তোমরা এক রক্তের। সবাইকে এক করে গড়ে ওঠ। বড়ই দুঃখের কথা, আজ চারিদিকে এর বিপরীতটাই দেখতে পাচ্ছি। তারা সেই রক্ত নিয়ে ক্ষেতে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়েছে। সব জমি এক রক্ত মাখা জমি। এই জমি আর রক্ত সকলের। জমি হতে রক্ত, আর রক্ত হতে জমি। কাজেই আমার জমি, সবার জমি। আমার কথাটা 'সবার', সকলের জন্য। সেই রক্ত মাখা জমি থেকে খাদ্যশস্য পৌঁছে দিচ্ছে সবার কাছে। তারা দেখছে, জমি হতেই রক্ত; রক্ত তো সেখানেই। সুতরাং তারা মাটি নিয়ে, ধুলো নিয়ে গায়ে মাখতে শুরু করেছে। শিব যেমন নিজ দেহে ধূলা, ছাই ভস্ম মাখতেন, তেমনি তারাও দেহে ধূলা মেখে থাকতো। কারণ তারা বলতো, দেহ আর মাটিতে কোন পার্থক্য নেই। এই দেহতো একদিন মাটি হয়ে যাবেই। সুতরাং সবাই আমরা এক মাটির সন্তান। এই বসুমতীর স্তন পান করে আমরা বেঁচে আছি। তাই এই বসুমতীকে ভাগ বাটোয়ারা করা যাবে না।

তারা বলতো, আমরা সব সন্তান একত্রিত হয়ে মাটির মানুষ হয়ে থাকবো। কারণ সবাই যে আমরা একই মায়ের গর্ভজাত সন্তান। এই গর্ভ হতেই আমরা আসছি। **এই ভুলোক হতেই আমাদের জন্ম। এর মধ্যে বিবাদ কোথায়? মাটিতেই আমাদের জন্ম। মাটিতেই আমাদের লয়, মাটিতেই আমাদের শেষ। এই ধূলাতেই চলেছে রং-এর খেলা। রক্তমাখা ধূলা করে, ধূলার সাথে রং মেখে সবার সাথে সবাই আলিঙ্গন করছে।** এই আলিঙ্গনের কি প্রয়োজনীয়তা? কি তার অর্থ? আমরা একজন আর একজনকে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করছি; প্রেম, ভালবাসার গভীরতা জানাচ্ছি। এই আলিঙ্গন নূতন নয়। স্বয়ং পৃথিবী, বসুমতী আমাদের প্রেমের বন্ধনে বেঁধে রেখেছেন। তিনি বুক পেতে দিয়েছেন, আর আমরা খনন করছি, অত্যাচার, অবিচার করছি দিনরাত এই পৃথিবীর বুকে। কিন্তু বসুমতী মুখ বুঁজে সহ্য করছেন। তিনি কখনও রাগ করে মুখ তুলে তাকান না। বসুমতী আমাদের আশীর্বাদ করছেন, **"তোমরাও এভাবে একজন আরেক জনকে বুক পেতে সহ্য করো এবং তোমাদের অন্তরে রেখে দিতে চেষ্টা করো। তোমরা আমাকে খণ্ড-**

বিখণ্ড করছো, আমি কিছু বলছি না। আমি চাই তৃপ্তি। আমার মাংস কেটে টুকরো টুকরো করে ফেল, তাতেও আমি খুশী হবো। তোমরা খুশী থেকো। আমি যেভাবে বুক পেতে দিয়েছি, সব সহ্য করছি, তোমরা ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ ভুলে বুক পেতে দাও। তাদের আলিঙ্গন দিয়ে তাদের সহ্য কর।"

আজকের যে খেলা, আজকের যে উৎসব, সেটা বর্ণের খেলা, রং-এর খেলা। যে বর্ণবোধে বর্ণ রয়েছে, যেই বর্ণবোধে গভীরতা রয়েছে, যেই বর্ণবোধে ছন্দ আছে, আমরা যার বন্দনা করছি, যার সুরে ডুবে আছি, যার সুরধ্বনির সুর নিয়ে ভরপুর আছি, সেটা হচ্ছে আকাশগত, আকাশস্থিত, আকাশমুখী। আকাশের বর্ণ নীল; নীলাকাশ। সেই বর্ণ আছে সাগরে। সাগরের দৃশ্য দেখে তার কিছুটা আভাষ পাওয়া যায়। মনে হয়, কে যেন নীল গুলে রেখেছে। নীলবর্ণ নীল দেখা যায়, আবার হাতে নিলে তোমার হাতের রং নেয়। তোমারই কথা বলে। সে বলছে, "আমি এমন একটি বর্ণ, যেই বর্ণের পাত্রে রাখ, তারই বর্ণ হয়ে যাই আমি।" আমরাও সেই বর্ণে নিজেদের মিশিয়ে দেব। নীল আকাশের সাথে সাগরের রং এক। সাগর আকাশের রং-এর সাথে মিলে মিশে এক বর্ণ হয়ে রয়েছে। আমাদের দেশে একদিকে ধলেশ্বরী, আরেক দিকে শীতলক্ষা, আরেক দিকে মেঘনা। তিনটা নদী যে একত্রিত হয়েছে, দেখলে বুঝা যায় না। সাগরের রং, আকাশের রং। এই রং তো অদ্ভুত! দেখা যায়, খুঁজে পাওয়া যায় না। আত্মহারা হয়ে যেতে হয়। এই রং-এ খালি ডুবেই থাকতে ইচ্ছে করে। **এই যে রং-এর খেলা। রং-এর সাথে রং মিলতি; এই মিলনের যে অনুষ্ঠান, এতে অদ্ভুত এক হারমনি আছে। এ যে সুসজ্জিত হারমনি; জগতের যে রং, এক বিরাট হারমনি (harmony) থেকে সৃষ্ট। তোমরা সেই হারমনিতে সুর দিচ্ছ, সেই হারমনি বাজাচ্ছ।** আর রয়েছে সেই নীলবর্ণ। আকাশের বর্ণ, কখনও সে হয় কৃষ্ণ, কখনও হয় লাল, আবার কখনও হয় বহু বর্ণ। কিন্তু সব বর্ণ মিলে মিশে হয়ে যায় নীল। তিনি (আকাশ) সব বর্ণকে বুক পেতে নেন। কিন্তু নীল বর্ণ যে তাঁর, সেই বর্ণকে কেউ খুঁজে পেতে পারে না। সে সবারটা নিয়ে পরিতৃপ্ত হচ্ছে।

আজকের দিনে সেই উৎসব। এমন দিনে দেশে দেশে অনেক উৎসবে অনেক মহান, ঋষি, ছেলে, মেয়ে, সখা সখী একত্রিত হয়। ভারতের অনেক জায়গায় নৃত্যের ভিতর দিয়ে এই উৎসব পালিত হয়। সেই নৃত্য অভিনব।

তারা বলতো, ''এস সবাই আমরা এক রং খেলি।'' এটাই হচ্ছে সাম্যবাদের প্রথম ধাপ। সাম্যবাদ এখান হতেই শুরু। সব জাতিকে এক জাতিতে এক নীতিতে যদি টেনে আনা যায়, তবে তো এক সুরে সব বাঁধা হয়ে যায়। তবেই তো সাম্যবাদের সুরে সবাইকে আনা যায়। দেবদেবীর পূজা-পার্বণ, যাগযজ্ঞ— এর উপর ভিত্তি করেই, রং-এর সাথে রং মিলতি করেই করা হয়। সামাজিক ব্যবস্থা, সামাজিক জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তা, সব কিছু মিটিয়ে নেবার যে ধাপ, এর থেকেই শুরু করে। সব কিছু তৈরীর, সব কিছু গড়ে ওঠার মূলই হচ্ছে এক রং। সুতরাং কত বড় উদ্দেশ্য নিয়ে এই রং-এর খেলা। এখনই যে খেলা খেলা করে মেতে ওঠে, এক রং পেলেই সেই খেলা হয়ে যায়। এই এক রং-এর যে কতবড় মূল্য। তাই তারা এই দোল উৎসবের ধাপে ধাপে উঠে উঠে বেদীর পর বেদী তৈরী করে রং-এর সাথে রং মিলিয়ে আকাশের দোলনায় দুলতে শুরু করলো। তারা বললো, ''সব দোলনায় দুলবে, কিন্তু সংস্কারের দুলনায় দুলবে না। বেদ থাকবে, ভিত্তি থাকবে। বাদাবাদি থাকবে না। তার ভিতর হতেই চরম স্তরে থেকে তুমি সেই দোলনায় দোল (দুলতে থাক)।'' সেই নীলবর্ণের সাথে এক বর্ণ করে সেই আকাশে সবাই দুলছে। দোলে এইজন্যই ঠাকুরকে উঠায়, বসায়, দোলনায় রাখে। তার সাথে সাথে বুড়ির ঘর পুড়িয়ে ফেলে। এটা হ'ল বহ্নি উৎসব।

এই বহ্নি উৎসবের অর্থ হলো, সমস্ত সংস্কারগুলোকে আগুনে পুড়াও। সেসব কিছু রাখবে না। সেগুলোকে আগুনে পুড়িয়ে শেষ করে দাও। যেগুলো সংস্কার হতে হতে আমাদের ঘাড়ে চেপে বসেছে, সেই সংস্কারের বাসাগুলোকে পুড়িয়ে দাও। তাই রাস্তায় রাস্তায় দেখা যায়, বুড়ীর ঘর পুড়ছে। যারা সংস্কারের বেড়াজালে সমাজকে দূষিত করছে, তাদের কুটির পুড়িয়ে ফেল। বেদজ্ঞ ঋষিরা বলছেন, ''সংস্কারের দ্বারা সমাজকে বিষময় করছে যারা, তাদের চাল (ঘরের ছাদ) পুড়িয়ে শেষ করে দাও। সেই আগুন, সেই বহ্নি হাতে নাও এবং যারা অন্যায় করবে, তোমাদের গতির পথে বাধার সৃষ্টি করবে, তাদের শেষ করে দাও।'' শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে থাকতেন, জায়গায় জায়গায় রং নিয়ে, শত শত বাঁশের তৈরী পিচকারি নিয়ে রং খেলতেন। কি ছেলে কি মেয়ে সবাই রং খেলতো। তিনি সবাইকে এক রং করে একমুখী করতে চেয়েছিলেন। তখন দেশে কোন অভাব ছিল না।

তাদের গান ছিল, ''আমাদের হাতে পিচকারি আছে। আমরা নিষ্ঠার পিচকারি দিয়ে যেন সবাইকে এক রং-এ আনতে পারি।'' বেদজ্ঞরা বলছেন, ''এইভাবে অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে জীবনযাপন করো। তারপর কণ্ঠে তুলসীর মালা বন্ধন করো।''

তুলসীর মালা কণ্ঠে কেন? এই তুলসীতে ১০৮টা ব্যাধি সারে। তা থেকেই এল ১০৮ বার জপ। কুকুর তুলসী গাছ পেলে অন্য গাছে প্রস্রাব করে না। তুলসী গাছেই প্রস্রাব করে। তুলসী গাছে যেইমাত্র প্রস্রাব করে, গঙ্গাজলের যে গুণ, সেরকম গুণে পরিণত করে দেয়, তুলসী গাছ তার স্পর্শে। তার ভিতর এরকম ক্ষমতা আছে। দৈবের থেকে বলছি, শতলোকেও যদি ঐরকম কিছু তুলসী গাছের উপর করে, তাহলেও সে অপবিত্র হয় না। বরং তার কাছাকাছি যারা আছে, তারাও পবিত্র হয়ে যায়। তাই তুলসীর মালা গলায় পরতে বলেছে। বলা হয়, তুলসীতে যে সত্য, নিষ্ঠা ও তেজ আছে, যে সত্ত্বগুণ তুলসীতে আছে, তা যদি কণ্ঠে থাকে, তুলসীর মালা যদি কণ্ঠে থাকে, তবে সবসময় সত্ত্বের গুণ, তেজ তার স্পর্শেতে হয়ে যাবে। তারপর কি বলেছে? বলছে, ''তা দিয়ে তুমি জপ করতে পার। সবসময় যার এত গুণ, এত সুর, কেউ তাকে বিষাক্ত করতে পারে না, অপবিত্র করতে পারে না। অন্য যে কোন গাছ জীবাণুময় হয়ে গেছে। কিন্তু যত জীবাণুই তুলসীগাছের উপর পড়ুক, তুলসী জীবাণুমুক্ত হয়।'' এইরকম যে জীবাণুমুক্ত বৃক্ষ, তার মালা যদি আমাদের কণ্ঠে থাকে, আমরাও মুক্ত হয়ে যাব। সবসময় মুক্ত অবস্থায় বিরাজ করবো। তারপর আরও আছে। দেখা গেছে, **তুলসী গাছ আর চোতরা পাতার গাছ এক জায়গায় আছে। স্থানীয় এক ব্যক্তি বললো, "গাছে জল দেব না, দেখি কি হয়।" শুধু ধ্বনি দিত। দেখা গেল, ধ্বনিতে তুলসী গাছ বেঁচে আছে। কিন্তু চোতরা গাছ মরে গেল। তুলসী গাছ শব্দ ধ্বনি পান করে, তার থেকে রস গ্রহণ করে বেঁচে রয়েছে।** তার থেকে সে প্রাণের স্পর্শ পেয়ে যাচ্ছে। তুমি যে কথা বলছো, তার থেকে সে রস পেয়ে যাচ্ছে। সেই তুলসীকে কেন্দ্র করে আসলো হরে কৃষ্ণ হরে রাম। হরি সর্ব অবস্থায় সব সময় যিনি হরণ করেন। তাই তিনি হরি। সবার নিকট হতে বিষটুকু হরণ করছেন, ধ্বনিটুকু গ্রহণ করছেন।

কয়েক হাজার বছর আগের কথা বলছি। গল্পের মত মনে হলেও গল্প

নয়। এক তুলসী বাগানে শতাধিক তুলসী গাছ। সেখানে ঋষিরা, মহানরা জপ করতেন, নাম করতেন। সেখানে তুলসী গাছ পরপর হয়ে আসছে। তুলসী মঞ্জরী আপনি প'ড়ছে, আপনি গজাচ্ছে। একবার ডাকাতি করে ডাকাতরা সেই তুলসী বাগানে লুকালো। চুপচাপ করে আছে। শতেকের উপর তুলসী গাছ। তারা শুনছে, গাছে গাছে যেন ধ্বনি হচ্ছে, 'রাম নারায়ণ রাম,' 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম'। সেখানে যারা নাম করেছে, গান করেছে টেপ রেকর্ডের ন্যায় তুলসী গাছের পাতায় পাতায় ডালে ডালে সুরগুলি রয়ে গেছে। মধ্যরাত্রে আপন সুরে হয়ে যাচ্ছে, 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম।' তোমরা সবাই বল, 'রাম নারায়ণ রাম।'

ডাকাতরা বলছে, ''একি রে বাবা। গাছে গাছে সুর দিচ্ছে।'' তাদের মনটা কেমন করে উঠলো। তারাও সেই সুরে সুরে দিতে লাগলো।

আজও কি সেই সুর নেই? আছে। আজও গাছে কথা বলে। আজও গাছে প্রাণ আছে। গাছে উপলব্ধি করে। এমন গাছ আছে, তুমি গাছের তলায় গেলে তোমায় জড়িয়ে ধরবে। আবার এমন গাছ আছে, ডাল বাড়িয়ে তোমার রক্ত পান করে নেবে। আজকের যে দিন, এই দোল পূর্ণিমার দিনে রং-এর সাথে রং মিলাবে আর তার সাথে ধ্বনি দেবে। পরপর সবাই তো চলে যাচ্ছে। পূর্বপুরুষরা সবাই তো চলে গেছেন। কাউকে পাবে না। কিন্তু ধ্বনিটা থাকে; সুরটা থেকে যাচ্ছে। তাই তুমি যদি ধ্বনিটা উচ্চারণ কর, ধ্বনির সাথে ধ্বনি মিলিয়ে ধ্বনি দিতে থাক, তবে সেই ধ্বনি থেকে যাবে। আজকের রং-এর খেলায় পূর্ণিমার দিন পূর্ণচন্দ্রের পূর্ণবিকাশ। অন্ধকারের থেকে একটু একটু করে নিজেকে সে বিকশিত করেছে নিজের সাধনায়। সেই তেজের সাধনা করেছে এবং নিজেকে নির্ভর করেছে তেজে। আমরাও তেমনি প্রত্যেকেই এক একটি গ্রহ। প্রত্যেকেই এক একটি চন্দ্র। **চন্দ্র তার আলোর জন্য সূর্যের উপর নির্ভর করে। সেই তেজের উপর নির্ভর করে। আমরাও তেজের সাথে তেজ মিলিয়ে দিনের পর দিন এক কলা, দু'কলা করে করে ষোল কলায় পরিপূর্ণ হয়ে যেন বিকশিত হতে পারি।** খালি আকাশে, যেখানে মেঘের গর্জন আছে, শান্তির বারি বর্ষণ আছে; আর আছে সেই গুরু গম্ভীর ধ্বনি, সেই গুরু গুরু ধ্বনি। আমাদের ভিতরও সেই গুরুগম্ভীর ধ্বনি, গুরু গুরু ধ্বনি আছে। আমরাও সেইভাবে সেই পথের পথিক হয়ে চলেছি।

যেই তেজে চন্দ্র, পৃথিবী, জীবজগৎ আলোকিত এবং প্রাণের স্পর্শ যাঁর থেকে আসছে, সেই প্রাণের স্পর্শ আমরাও পেয়ে আসছি। আমরা সেই চন্দ্রের স্বরূপ সাধনায় মগ্ন থেকে আকাশে বিরাজ করে এগিয়ে যাব।

কি নিয়ে? প্রকৃতির অনন্তগতির পথে গতি নিয়ে গতিময় হয়ে অনন্তপথের পথিক হিসাবে আমরা এগিয়ে যাব। সূর্যের আবর্তনে বিবর্তনে ঋতুগুলো যেমন ঘুরে ঘুরে আসে। গাছে গাছে প্রাণের সঞ্চার হয়। গাছে আজ নূতন প্রাণ গজাচ্ছে। কখনও শুকিয়ে যায়; আবার সতেজ হয়ে ওঠে। এই আবর্তনের মাঝ দিয়ে সতেজ হবার দিক দিয়ে তারই ব্যবস্থা রয়েছে। যত আবর্তন বিবর্তন যাই হোক, পৃথিবীর বক্ষে যা কিছু হোক, এই বিশ্বের সবাই যেন আকাশগত হয়ে মহাশূন্যের মাঝে সেই সতেজতার দিকে, জাগরণের দিকে, পরিপূর্ণতার দিকে অবিরাম দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। আমরা তারই যাত্রিক, তারই পথিক। আমরাও সেভাবে ফুটতে ফুটতে এগিয়ে যাচ্ছি। **মৃত্যু পথের যাত্রিক, ক্রমশঃ ক্রমশঃ শ্মশানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আবর্তনের বিবর্তনের পালাতে আমরাও চলছি। চলছি কোথায়? সেই সুরধ্বনির সুর নিয়ে সবাইকে এক রং-এ মিলিয়ে দিয়ে যাতে চলতে পারি, এক বর্ণে এক সুরে থেকে যাতে চলতে পারি, তারই প্রচেষ্টায় চলছি।** আজকের দিনে দোল যাত্রা; বেদীতে বেদীতে (চক্রে চক্রে) রং-এর খেলা। বেদীর পর বেদীতে উঠে দেহবীণাযন্ত্রের আজ্ঞা সহস্রারে সমস্ত চক্র ভেদ করে পূর্ণভাবে সজীবতায় যেন বিকশিত হতে পারি। পৃথিবীর বুকে সর্ব বস্তুতে এই সজীবতার সুর পাচ্ছি। এই সজীবতা নিষ্ঠার সাথে, আকাশের বর্ণের সাথে বর্ণ মিলিয়ে চলছে বলেই সে আজও সজীব। আমরা তাঁর সন্তান। তাই আমরাও এগিয়ে চলেছি। আমরা সেই প্রাণের সাড়াকে সুরে এনে সেই পূর্ণকে যেন বিকশিত করতে পারি। সেই পূর্ণের বিকাশে বিকশিত হয়ে আমরা যেন পূর্ণ হতে পারি। তাই এক রং। তাই সকল রং-এর সাথে রং মিলাতে হলে বেদ বলছে, ''রং এর সাথে সাথে তুমি গুরুগম্ভীর সুরের সাথে সুর মিলাও।''

তাই একদিকে দেবর্ষি, আর একদিকে কৃষ্ণ আর রাধা। রাধা আজকের দিনে ধুলো মেখে 'হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ' করে মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন আর বলছিলেন, ''আমাতে আর তোমাতে যেন কোন বৈষম্য, কোন বিভেদ না তাকে। আমি আর তুমি যেন এক আত্মা হয়ে যেতে পারি।'' দেবর্ষিকে তিনি

শোনাচ্ছিলেন তাঁর অন্তরের বার্তা। তিনি দেবর্ষিকে রং মাখিয়ে দিলেন। আজকের দিনে রাধা নীলাভ এক শাড়ী পরেছিলেন। আকাশের মত নীল তার (শাড়ীর) রং। কপালে দিয়েছিলেন চন্দন আর মাথায় তুলসীর মঞ্জরী। গায়ে ছিল গাছের ছাল বাকলা। তিনি (রাধা) বাজাতে বাজাতে যমুনার তীরে চলেছেন। সামনে সুন্দর একটি বাছুর আর গাভী আস্তে আস্তে রাধার দিকে আসছে। বাছুরটির রাধাকে খুব ভাল লাগলো। গাভীরও রাধাকে ভাল লাগলো। রাধা বলছেন, ''আমি আজ যমুনার তীর দিয়ে যাচ্ছি। আকাশের চিন্তায় বিভোর থাকবো।''

দেবর্ষি— মা, তুমি একা একা সন্ধ্যা লগনে কোথায় যাচ্ছ?

রাধা — কোথায় যাচ্ছি, বলতে পারছি না।

দেবর্ষি — মা, আমি তোমার সাথে সাথে থাকবো। তুমি কিছু বলো।

তখন রাধা বিষ্ণুকে, সমস্ত দেবদেবতাকে স্মরণ করে, সব বর্ণের সাথে এক বর্ণ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, ''সব গ্রহ, সমস্ত পৃথিবী, সূর্য কি বলছে?'' রাধা বলছেন, হে দেবর্ষি, সবাই বলছে, রাম নারায়ণ রাম''। রাধা বলছেন, ''হে দেবর্ষি, সর্বজীব মুক্ত হবে যদি করে এই মহানাম রাম নারায়ণ রাম। এইভাবে এই নামের সাথে সব মিশে আছে। এই নাম প্রচার কর। এই নাম ঘরে ঘরে বিতরণ করো। বেদকে ভিত্তি করে এই নামই প্রচার কর। সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আসবে এবং জীব তাহলে মুক্ত অবস্থায় বিচরণ করবে।''

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

তোমরা সব সন্ন্যাসী মৃত্যু যাদের আছে তারাই হলো সত্যিকারের সন্ন্যাসী

২৪শে মার্চ, ১৯৭৮
সুখচরধাম

আমি তোমাদের সুখ দুঃখের সাথে নিজেকে মিশিয়ে রেখেছি। তোমাদেরই ঘরের একজন হয়ে রয়েছি আমি। ১৮০০ ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে আমি মানুষ করেছি। এখন তারা বড় হয়ে গেছে তো। বড় হয়ে গেলেই বিপদ। বদনাম দিতে ছাড়ে না। আমাকেও বদনাম দেওয়া শুরু করেছে। আমাকে গালি দিক, বদনাম দিক, যা খুশী তাই বলুক, আমি কিছু মনে করি না। গালিটাই হইল আশীর্বাদ। যত গালি, যত অপবাদ, যত নিন্দা হবে, তত আমার ভক্ত বাড়বে। **আমি পত্রিকাগুলিকে, সংবাদপত্রগুলিকে জানিয়েছি, তোমরা ইচ্ছামতন আমার বদনাম দিবা। দোহাই ধর্ম, আমার প্রশংসা করো না। তোমরা প্রশংসা করলেই আমার ভয় হয়। যত পার, যতরকম অপবাদ আছে তোমাদের ইতিহাসে, করে যাও।**

শ্রীকৃষ্ণের তো শতনাম, সহস্রনাম। আমার নামে সহস্র বদনাম দিয়ে পত্রিকায় লেখ। বদনাম কত আর দেবে? ইলাস্টিক টানতে টানতে ছিঁড়ে গেছে শেষ পর্যন্ত। আর বদনাম দিতে পারে না। বদনাম দিয়ে কি করবে? ১ কোটি ১২ লক্ষের উপরে শিষ্য আমার। ভারতবর্ষে আর কারও নাই। তার উপরে ২/৩ কোটি followers (অনুগামী)। এরমধ্যে যতরকম সম্ভব সাংঘাতিক type-এর লোক আছে। রিভলভারধারী, gun, যতরকম টাইপের (type-এর) যা যা আছে, সমস্তরকম এইখানে আছে। আমি তাদের দমাইয়া রাখছি (দমিয়ে রেখেছি)। নকশালের ছেলে হাজার হাজার এসে পড়েছে। দমাইয়া রেখেছি। ঝগড়া লাগলে অনেকে বলে, 'যা বেটা পিছনে লাগ'—

এই সমস্ত ক্ষমতার অপব্যবহার আমি করি না। আমিই বরং দোষী হইয়া হাতজোড় করে বলি, ''যা বাবা, হয়ে গেছে, হয়ে গেছে, মিটিয়ে নাও।'' কিন্তু ব্যাপারটা হইল, তাতেই পেয়ে বসে।

সবচেয়ে দুঃখজনক হ'ল, ছেলেরা মেয়েরা যারা এখানে আসা যাওয়া করে, তারা যদি দুঃখ পেয়ে আসে। তোমাদের বাবা, চোর থাক, ডাকাত থাক, বদ থাক, যাই থাক; তোমাদের বাবাকে কেউ যদি নিন্দা করে, তোমাদের তো লাগবে, সেটাই স্বাভাবিক। ডাকাত হলেও বাপ তো তোমাদের। বাপ যখন হয়ে গেছি, ১ কোটি ১২ লক্ষ লোকের বাবা। ডাকাত যদি কেউ বলে কি করবে, শুনতে হবে তোমাদের। ঠিক আছে, আমার বাবা ডাকাত। শুনে এলে। আবার বাবায় হ্যান, বাবায় ত্যান, শুনে নিলে। রাগ করবে না। কত সুনাম হলে এই কথাটা হয়। কার বদনাম হতে পারে? যার আছে, তারই বদনাম হয়। যার নাই, তার কি বদনাম হবে বলতো? বড় গাছের বড় ঝড়। এই গাছে কি ঝড় লাগবে বলতো? সুতরাং যত বদনাম হবে আমাদের, ততই মনে করবে, চারদিকে ছেয়ে যাচ্ছে।

শ্রীকৃষ্ণ বদনামের হাত থেকে আজও রেহাই পাচ্ছেন না। তবু 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'। রাধাকৃষ্ণের ঝুলনে বৃন্দাবনে তাঁর পদরজঃ পদরেণু আজও সবাই মাথায় নিয়ে চলেছে। এখনও ভক্তরা সবাই তাঁকেই স্মরণ করে। নবদ্বীপে দেখ, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু হরি হয়ে হরি ভজেছিলেন। নবদ্বীপের ধুলিকণাকে তেমনি সবাই গ্রহণ করছে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জীবনে নানা অপবাদ, লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন। নানারকম কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়ে অনেক কথা তিনি শুনেছেন। আজও কৃষ্ণ সেই অপবাদ থেকে রক্ষা পাননি। তাই বলতে পার, অপবাদ হচ্ছে জীবনের একটা বিরাট অধ্যায়। কৃষ্ণপ্রেম বিরাটের সুরে ভরা, ব্যাপকতায় ভরা। কৃষ্ণপ্রেমে তিনি সবাইকে এক করতে চেয়েছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বললেন যে, প্রেমের মাধ্যমে সবাইকে এক করি। তাই এক রঙের খেলা।

আবীর খেলা হচ্ছে এক রঙের খেলা। আবীর হচ্ছে এক রঙ। এক রঙের মাধ্যমে সবাইকে এক কর। তোমরা সবাই যদি মুখে রঙ দাও, কেউ কাউকে চিনতে পারবে? কেউ কাউকে চিনতে পারবে না। সব এক রঙ। এই

এক রঙে রঙীন হয়ে রঙ খেলার জন্যই এই ব্যবস্থা। আজকাল রঙে একটু বেশী-কম হয়ে গেছে নিজেদের মধ্যে। আমি বলেছি, সবাইকে ডাক। এক রঙে ঢেকে দাও। আর যার যা কিছু ভুলত্রুটি আছে, মিটিয়ে নাও। ওরা বলছে, অন্যরা মিশতে চায় না। হ্যান করতে চায় না, ত্যান করতে চায় না। আমার কাছে অভিযোগ করছে। আমি বলেছি, তাই কি কখনও হয়? এটা রাগের বশে একটা সাময়িক কথা। এই রাগের জের কতক্ষণ? তার উপর কি নির্ভর করা চলে? একটু ম্যালেরিয়া জ্বর হলে সাময়িক বিছানায় পড়ে থাকে। তোমরা প্রস্তুতি নিয়ে থেকো। এই রঙের খেলায় আমরা যেন সমস্ত দেশব্যাপী এক রঙের মধ্যে থাকতে পারি। সমস্ত দেশব্যাপী যেন এক রঙ করতে পারি।

আমরা এক রঙের পূজারী; এক নীতির পূজারী। সর্বত্র সর্বদেশে সর্বজাতিতে এই রঙ মিলিয়ে আমরা যেন চলতে পারি। একটা রঙই যেন থাকে। দোস্‌রা রঙে যেন আমরা না যাই। সুতরাং আমরা তারই (এক নীতিরই) পূজারী। আমরা সেইভাবেই কাজ করবো। সেইভাবেই যেন আমরা চলতে পারি। সপ্তাহে ১টা, ২টা, ৩টা করে মিটিং চলছে জানো? কালকে এক জায়গায় মিটিং করে আসছি। সমানে মিটিং চলছে। ক্লান্ত হয়ে পড়ছি না? তাই তোমরা নিজেরা একটু প্রচারকার্যে এগিয়ে যাও। প্রচারকার্যে লিপ্ত থেকো। শাখার পর শাখা বাড়াবে। আর ঐ সমস্ত কথা ধরবে না। **যে যা খুশী বলুক, যে যা খুশী করে করুক, তোমরা ওসবে থাকবে না। তোমরা কি করবে? মার খেয়ে নাম যাচে গৌর নিত্যানন্দ।**

তোমরা একটু মার খাও। মার না খেলে শক্ত হয় না। দুরমুজ করে দেখ না, বাড়ী তৈরী করতে গেলে। ভিত শক্ত করতে গেলে তোমাদের দুরমুজ হওয়া দরকার। **আঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে তোমরা জীবনের পথে এগিয়ে যাবে। জীবনের পথে আঘাত প্রতিঘাতের প্রয়োজন আছে। কে কি বললো, কে কি করলো, এই খুচরা ঝগড়া করতে গিয়ে সব সময় নষ্ট, বুঝতে পেরেছ? এর লগে (সঙ্গে) তর্ক, ওর লগে বিতর্ক করতে গিয়া আসল কাজ পণ্ড; দরকার নাই।** কিল খেয়ে কিল হজম করো। কে তোমাদের সাথে কতটুকু সহযোগিতা করছে, আর কারা সহযোগিতা করছে না, একটা list তৈরী করো। বাজার কর, হাট কর, list থাকে না? list করে রেখো। এই

list তোমাদের পরে কাজে লাগবে।

তোমরা এই যে মহানাম হরেকৃষ্ণ হরেরাম করে যাচ্ছো, তারই নামে নাম মহাকাশের মহানাম মহা স্বরগ্রাম রাম নারায়ণ রাম। এই নাম যেখানে যায়, সেখানেই গা জ্বলতে আরম্ভ করেছে। এই গা জ্বলা নাম, গায়ে জ্বালাধরা নাম বড় সাংঘাতিক। অনেকে বলে, এই রাম নারায়ণ রাম আইছে রে। এরা কি দানবই ভাবে, না দস্যুই ভাবে, না বন্ধুই ভাবে, না কারও নাম ভাবে, তাও জানি না। নর্থ বেঙ্গলে গেছে এক জায়গায়। এই রাম নারায়ণ রাম লোক আসছে রে, সইরা (সরে) পর। কি ভাবতাছে, কও দেখি।

এদিকে এক জায়গায় হরেকৃষ্ণ, হরেরাম কীর্তন চলছে। আর রাম নারায়ণ রাম গানের লোকেরা দাঁড়াইয়া আছে। আগে কেন হরেকৃষ্ণ হরেরাম কীর্তন করলো, সেইজন্য ওরা গান গাবে না। ঐখান থিকা (থেকে) ট্রাঙ্ককল করছে আমার এখানে, বাবায় যদি বলেন, তাইলে করুম। আমি বললাম, আল্লা হো-আকবরও যদি হয়, আগে করবা। তারপর রাম নারায়ণ রাম কইরো (ক'রো)। আল্লা-হো-আকবর যদি আজানের ধ্বনি দিতে হয় আগে, কানে আঙুল দিয়া আজান দিবা। তারপর রাম নারায়ণ রাম করবা।

— আইচ্ছা বাবা।

— হরেকৃষ্ণ হরেরাম, কালীকীর্তন, সুবচনী কীর্তন, মঙ্গলচণ্ডী কীর্তন, যত আছে সব শেষ কইরা (করে) তোমাগো কীর্তনটা কইরো। তাইলেই হবে ভাল।

— আইচ্ছা বাবা, বুঝতে পারি নাই।

এইবার ওরা গিয়াই হরেকৃষ্ণ হরেরাম গান আরম্ভ কইরা দিচ্ছে। সেখানকার লোকেরা বলে, আপনারা ৪০/৫০ জন আইয়া হঠাৎ হরেকৃষ্ণ হরেরাম শুরু করছেন?

— না, না। এই মধুর নাম সবসময় আমাদের। মধুর নাম বইলা (ব'লে) শুরু করছে, বুঝছো? ঘণ্টাখানেক হরেকৃষ্ণ কীর্তন কইরা চুপ কইরা দাঁড়াইয়া আছে।

— কি, দাঁড়াইয়া আছেন যে।

— আমাগো (আমাদের) নামটা একটু করতে দিবেন কি?

— নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, করুন। আগে করতে দেয় নাই। এখন রাজী হয়েছে।

এই করতে শুরু করেছে রাম নারায়ণ রাম। এক দেশের রাজা যখন আরেক দেশে যায়, এই দেশের গান তখন সেইদেশে শুনায়। এই দেশের প্রেসিডেন্ট অন্যদেশে গেলে জনগণমন শুনায়। আবার রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট যদি এই দেশে আসে রাশিয়ার জনগণমন (ওখানকার জাতীয়সঙ্গীত) শুনাবে এখানে। প্রথমে শুনাবে তাদের গান, তারপরে আমাদের গান। তাই তোমরা যখন যেখানে যাবে, তাদের কীর্তনটা আগে করবে। তারপর তোমাদের কীর্তনের Injection দিয়ে আসবে। ব্যাস্। **এমন এই কীর্তন জান, এমন অর্থে ভরা, ব্যাখ্যায় ভরা, যুক্তিতে ভরা, যার তুলনা হয় না। মহাকাশের মহানামের মহা স্বরগ্রাম এই রাম নারায়ণ রাম। এই স্বরগ্রাম যেখানে যেখানে ঢুইকা (ঢুকে) পড়ছে, সেইখান থিকাই (থেকেই) দুর্নীতিকারীদের অসুবিধার সৃষ্টি করছে। বুঝতে পেরেছ?** তাই তোমরা এতটুকুন সময় নষ্ট করবে না। একটা রঙ তোমরা সব জায়গায় ছড়িয়ে দেবে।

এই রাম নারায়ণ রাম মহানামের যখন সৃষ্টি হইল, তখন এখানকার রামেরও জন্ম হয় নাই, নারায়ণেরও জন্ম হয় নাই। তোমরা মনে কোর না, এই পৃথিবীর কারও নাম অনুয়ায়ী মহাকাশের ঐ নাম। মহাকাশের মহানামের নামানুযায়ী এখানকার এই রাম, নারায়ণ ইত্যাদির সব নাম। এইটা মনে রাইখো (রেখো)। 'রাম নারায়ণ রাম' এই মহাকাশের মহানাম মহা স্বরগ্রামের নাম অনুযায়ী এখানকার রাম, শ্যাম, যদু, মধু সব ব্যাটার নাম। কৃষ্ণ ঐ মহাকাশের নাম। মহাকাশের কৃষ্ণের নাম অনুযায়ী এখানে নাম রাখছেন কৃষ্ণ (বৃন্দাবনের)। ঐ ধারার থিকা (থেকে) হইল রাধা। ধা রা ধা ধা ধা রা। রাধা— ধারা ধারা ধারা ধারা।

ঐ কৃষ্ণবর্ণ হইল আকাশ। আকাশের নাম হইল কৃষ্ণ। ঐ মহাকাশরূপী কৃষ্ণের নাম অনুযায়ী এখানে যার যতটুকু গুণ দেখছেন, সেই অনুযায়ী এখানকার ব্যক্তিদের নাম রাখছেন। রাধারে দেখছে, একেবারে কৃষ্ণগত প্রাণ। ঐ মহাকাশের মহাশূন্যের সৃষ্টির ধারার থেকে হইল রাধা। রাধা কৃষ্ণগত প্রাণ। **ঐ রাধাকৃষ্ণের যুগল এখানকার মানচিত্রস্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে।**

তাই যুগলমূর্ত্তিরূপে রাধাকৃষ্ণের বর্ণনা করা হয়েছে। তোমরা মনে কোর না, কৃষ্ণ পরের বৌকে নিয়ে বসে রয়েছে, দূর। এই কামও (কাজও) করেন নাই তিনি। রাধাকৃষ্ণের যুগলকে মূর্ত্তিরূপে ব্যবহার করলেন মানচিত্র স্বরূপ।

এই যে স্কুলের দেওয়ালে মানচিত্র থাকতো, মাষ্টারমশাই কইতেন, উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে মহাসাগর, অমুক খানে অমুক; সমস্ত মানচিত্রটা বুঝাইয়া দিলেন। তাতে কি একেবারে হইয়া গেল, সমস্ত দেশ ভ্রমণ কইরা আসলাম? উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে মহাসাগর— একেবারে হগল (সকল) জায়গায় ঘুইরা (ঘুরে) আইসা পড়লাম? **ঐ দেওয়ালে মানচিত্রটার মইধ্যে (মধ্যে) সব আছে। মানচিত্রটার মইধ্যে যা আছে, সেইটা পইড়া তিনি আমাদের জানালেন। তাতে কি আমরা কি সবদেশ ঘুইরা আইয়া (এসে) পড়লাম? তা হবে না। এইরকমভাবে বিশ্বের মানচিত্রটা রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তির মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।** রাধাকৃষ্ণের বর্ণনাটা করেছেন মানচিত্রস্বরূপ। তারপর কি করেছেন? কৃষ্ণের হাতে বাঁশী দিয়েছেন। কৃষ্ণ বংশীধ্বনি করছেন। তোমরা মনে কোর না, একটা বাঁশের বাঁশী লইয়া আইছেন কৃষ্ণ। এইটা বাঁশের বাঁশী না। বংশ ঠিকই। বাঁশকে বংশ কয়। ঐ বংশেরই বাঁশী। কিন্তু বংশ বলতে গেলে কোন বংশ? এই যে বিয়ে শাদী ঠিক করে, কোন্ বংশের, কোন্ কুলের খোঁজ নেয় না? সেই বংশের বাঁশী বাজায়। সেই বংশটা কি? কৃষ্ণের হাতে যে বাঁশী, তার বংশটা কি?

এই যে মহাকাশের বুকে অগণিত গ্রহনক্ষত্র প্রত্যেকেরই বংশ আছে। এই যে পৃথিবী একটা গ্রহ, দূর থিকা এইটারে তারার মতন ছোট একটা দেখা যায়। আবার অনেক তারায় (star-এ) এইরকম কত মানুষজন আছে, কত পশুপাখী আছে, জীবজন্তু আছে। কোনটার মধ্যে আছে, কোনটার মধ্যে নাই। সব গ্রহের বংশের, সব বংশের বাঁশী কৃষ্ণ বাজাচ্ছেন। কৃষ্ণ হচ্ছেন আকাশ। আকাশের মধ্যে যে আশ্রয় নেয়, তারই বংশ আছে। আকাশে আশ্রয় নিয়েছে সব বংশেরা। সেই বংশের বাঁশী কৃষ্ণই বাজাচ্ছেন। কে বাজাচ্ছেন? কৃষ্ণ। রাধাকৃষ্ণ একত্র হয়ে যুগলমূর্ত্তিতে কি বাজাচ্ছেন? দেহবীণাযন্ত্রের সপ্তসুরে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রারে— অনন্ত মহাশূন্যের অগণিত গ্রহনক্ষত্রের বংশের বাঁশী বাজাচ্ছেন— সা রে গা মা পা ধা নি। এই দেহবীণাযন্ত্রেই সুর বাজালেন রাম নারায়ণ রাম।

একটা বটগাছের বীজ এতটুকু। কিন্তু পুঁতলে বীজটা কি বিশাল চেহারা নেয়। আরে বাপরে বাপরে বাপরে। ইচ্ছা করলে ৪০০ বটগাছ নিয়া যাইতে পার তুমি। ৪০০ বটগাছের বীজ নিয়া যাইতাছ (যাচ্ছ)।

— তোমার কাছে কি আছে?

— আমি ৪০০ বটগাছ নিয়া যাইতাছি।

— ৪০০ বটগাছ? মাথা খারাপ নাকি?

— এই দেখ, লাল লাল বটগাছের বীজ। এই ৪০০ বটগাছ পুঁতে দিলে এক একটা বটগাছে দুই, চার, পাঁচশো মানুষ লইয়া উইঠা (উঠে) বসা যায়। এই রাম নারায়ণ রামের ধ্বনি হইল মহাশূন্যে মহাকাশের বীজস্বরূপ। এই বীজ হইল দেহবীণাযন্ত্রের এইখানে গুহ্যদ্বারে মূলাধার। মূলাধারে মূলগ্রন্থিতে বীজ। তারপর আসলো (এল) স্বাধিষ্ঠান। স্বাধিষ্ঠানের এক ফোঁটা জল, এক ফোঁটা বীর্য, বীর্যপাত। তাতেই দেখ, সারা বিশ্বের সকলে পাগল। বিশ্বের সৃষ্টির sample দিয়েছে এইখানে। ফ্যাক্টরীর sample দেয় না? নমুনা? একটুখানি sample দিয়েছে। একটু বীর্য ফেলে দিয়েছে। সেই বীর্যটা কি? উন্মাদনার উন্মত্ততার বৃত্তির নিবৃত্তি। এই বৃত্তির নিবৃত্তির খেলায় কত প্রেম, কত ভালবাসা, "আমার জন্য তুমি ভিক্ষুক হইবা। আমি রাস্তায় গেলে তুমি রাস্তায় যাইবা। আসো চল যাই। আমরা রাস্তায় ঘুরি। একদিন তোমাকে পাবই।" এ্যাঁ। আরে বাবা। সব ঐ একফোঁটার জন্য। **হিজরা আছে। হিজরারে তো কেউ এই কথা কয় না। একটা হিজরারে যদি এই কথা কইতো, "আয় ভাই, তর (তোর) লগে প্রেম করি। আমার গতি তোর গতি একগতি," তাইলে বুঝতাম। একটা হিজরারে কেউ এইকথা বলবে? কেউ বলবে না।**

এক ফোঁটা বীর্যপাত। তার ঠেলায় সব উথাল পাথাল। চুলকানি বোঝ? যাত্রাতে এক ভদ্রলোক রাজার পার্ট নিছিল (নিয়েছিল)। নাম অখিল ঠাকুর। ওর শেষরাতে চুলকানি হয়। আমি গেছিলাম যাত্রা দেখতে। আমরা বসেছি সব বাচ্চারা। এতটুকু এতটুকু বাচ্চারা সব। তখন বলতাছে, হে কুন্তী (জোরে জোরে) হে কুন্তী, তু-তু-তু-তু চুলকানি উইঠা (উঠে) গেছে। আর চুলকানি উইঠা গেছে। খেয়াল নাই। মনে করছে, বাড়ীতে ঘুমাইয়া আছে

বুঝি। ইচ্ছামতো চুলকাইতেছে (চুলকাচ্ছে)। প্রম্পটার কইতাছে (বলছে), অখিলদা, অখিলদা আপনি কিন্তু ষ্টেজে আছেন। আপনি কিন্তু ষ্টেজে আছেন। এ্যাঁ, আমি ষ্টেজে আছি? আমি বাড়ীতে না? আমি ষ্টেজে ও-ও-ও-ও-এই মনে পড়লো।

চুলকানি যখন হয়, দাঁত কিড়মিড় কইরা (করে) দুনিয়ার স্বাদ এইখানে, চুলকানিতে। কিন্তু চুলকানির একটা রস আছে আবার। যখন চুলকানির রস বেরোতে থাকে, তখন নুন নুন তো। ঐ রসে আবার নুন বেশী থাকে। তখন যে জ্বালা, হায় হায় রে। ক্যান্ (কেন) গেছিলাম রে। হায় হায় রে। ক্যান্ যে চুলকাইতে (চুলকাতে) গেছিলাম রে।

এই দুনিয়াটা হইল, এই প্রেমটা হইল চুলকানি। মনে হয়, প্রথম প্রেম কত মধুর। তারপর চুলকানির জ্বালা শুরু হয়। এই বাচ্চা হইল। এইটায় মরে, ঐটায় যায়, ঐটারে হাসপাতালে পাঠায়। স্বামী এদিকে সন্দেহ করে। স্ত্রী স্বামীরে সন্দেহ করে। তারপরে কাপড় জামা লইয়া, হ্যান লইয়া ত্যান লইয়া অশান্তি শুরু হয়। এইকম কইরা কইরা (করে করে) অশান্তির ঠেলায় অস্থির হইয়া মনে করে, ক্যান্ গেছিলাম এর মধ্যে। পরিষ্কার, কোনটার মধ্যে শান্তি নাই। অশান্তির পর অশান্তি।

সুতরাং একফোঁটা বীর্যপাত। এই যে একফোঁটা, এতবড় সাগরের এক ফোঁটা জলেই (বীর্যেই) এই তৃপ্তি, এই আনন্দ। এটারে বলে সঙ্গম। এই সঙ্গমের কত ফোঁটা হইলে একটা সাগর হয়। এইটা হইল এইখানে (দুই ভ্রূর মাঝখানে, দ্বিদলে, আজ্ঞাচক্রে) আর এইখানে (মস্তিকে, সহস্রারে), বুঝছো?

তোমরা যে শিবলিঙ্গ পূজা কর, অন্য কারও কথা বলতে পারবে, আস, তোমার লিঙ্গটা পূজা করি? শিবের বেলা তো একেবারে কইয়া ফেলাও (বলে ফেল)। লিঙ্গ তো ঠিকই। অমুকের লিঙ্গ পূজা করি। কইতে পারবা? পারবে না। শিবের লিঙ্গ পূজা কর। হ্যাঁ শিবেরই লিঙ্গ পূজা হয়। শিবের মূর্ত্তি নাই। যা দেখতাছ, এটা কিন্তু শিবের লিঙ্গটা। এইভাবে আছে। শিব এবং পার্বতীর মিলনে গাঁথা। বুঝতে পেরেছ? শিব এবং পার্বতীর মিলনের যোগসূত্রে গাঁথা। এই যে যোগাযোগ— সঙ্গম অবস্থায়, প্রকৃতি পুরুষের মিলিত অবস্থায় অনন্ত যোগসূত্রে যুক্ত যে হ'ল, এই হ'ল সেই। এই

অবস্থায় কেন দিলেন? চির সঙ্গমে রত। চির সঙ্গম। চিরসঙ্গম কে করতে পারে? তোমরা চিরসঙ্গম করতে পারবে না। ৫ মিনিট, ১০ মিনিট, ১৫ মিনিট ২০ মিনিটে হাঁপাইয়া চিৎ হইয়া পইরা থাকবা (পড়ে থাকবে), খোলাখুলি কথা। বাপ-ব্যাটার কথা। বাপ ব্যাটা-বেটীর কথা শোন। **তোমাদের সঙ্গম হচ্ছে ১০ মিঃ/২০ মিনিট। আর শিব সঙ্গম করছেন অনন্তকালের সঙ্গম, চিরসঙ্গম। চিরসঙ্গম কে করতে পারে? তিনিই করতে পারেন। তোমাদের বীর্যপাত হয়ে যায়। ঠাস্ কইরা পড়লো। শেষ হইয়া গেলা। আর শিবের সেই মহাবীর্যপাত। সেই বীর্যপাতে অনন্ত ধারা। শিবের সেই বীর্যপাতে অনন্ত ধারা ধারাবাহিকভাবে সেই maintain থেকে fountain-এর মতো, ঝর্ণার মতো পর্বতের গা বেয়ে পড়তে থাকে।** অনর্গল পড়তে থাকে সেই ধারা, বুঝতে পেরেছ? সেই ঝর্ণা দেখেছ? পাহাড় থেকে ঝর্ণা অবিরাম ধারায় পড়তে থাকে। সেই জলেই তো সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আবহমান কাল থেকে চলছে সেই বীর্যের ধারা, সেই চিরসঙ্গম। সেই মহাশিব। শিব এবং শক্তি সমন্বয়ে হচ্ছে এই বীর্যের ধারা। তাই তো শিবশক্তি, প্রকৃতি পুরুষ, রাধাকৃষ্ণ।

এখন কৃষ্ণের ঐ মহাকাশের ধারা থেকেই হ'ল রাধা। ধারাবাহিক ধারা অনুযায়ী সৃষ্টি হ'ল ধরার। ধরা থেকেই ধরিত্রীর সৃষ্টি। সেই ধারা। ধারা ধারা বারবার বললেই হয় রাধা। কৃষ্ণ ছাড়া রাধা বাঁচতে পারে না। কারণ সেই কৃষ্ণ থেকেই ধারা চলছে।

তাই তোমরা গুরুগত প্রাণ হয়ে এক সুরে বাঁধা থাকবে। কৃষ্ণ বাজিয়েছিলেন অনন্ত বিশ্বের সুর। অনন্ত বংশের সুর। রাম নারায়ণ রাম। রাম নারায়ণ রাম। রাম নারায়ণ রাম।

বেদমন্ত্র ..... মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রার। দেহবীণাযন্ত্রের সপ্তচক্রের সপ্তসুরে মহানামের মহাসুর আছে সাধা ও গাঁথা। মূলাধারে গুহ্যদ্বারে মূলমন্ত্র মূলবীজ। তারপর স্বাধিষ্ঠানে সৃষ্টির ধারা। মণিপুর হ'ল নাভিমূল— দশটা মাস মাতৃগর্ভে ছিলে। নিজে খাও নাই। অনাহতে (বক্ষোদেশে) চলছে ধপ্ ধপ্ ধপ্ ধপ্ শব্দ। সূর্যের মধ্যে গলিত ধাতুর ঢেউ পড়ছে ধপাস্ ধপাস্। সূর্যের মধ্যে গলিত ধাতু, বিরাট

তার ঢেউ। সদাসর্বদা পড়ছে ধপাস্ ধপাস্ করে। সেই বিরাট ঢেউয়ের ছিটকানি ওঠে হাজার হাজার মাইল উপরে। সেই ধপ্‌ধপানি শব্দ চলছে সমস্ত জীবজগতের ভিতরে। জীবজগতের সমস্ত প্রাণীর ভিতরে সেই ধপাস্ ধপাস্ ধুপ্ ধুপ্ শব্দ। তাই আমরা সূর্যের সন্তান। এখনও $96^0/97^0$ তাপ আছে আমাদের ভিতরে। কারও কারও 98^0 তাপ আছে। আমাদের এই 96^0, সূর্যের 96^0; সেই তাপে আমাদের তাপ। সেই ধপ্‌ধপানি, সেই ধপ্ ধপ্ ধপ্।

তাই তোমরা মহাকর্মী, সূর্যের মত কর্মী। আমাদের পূর্বপুরুষ আমাদের নমস্য। তাঁরই সৃষ্ট-বাতাস, জল, মাটি আমাদের পূর্বপুরুষ। আমরা তাঁদের থেকেই হয়েছি। তাঁরা বিরাট কর্মী। তাঁরা কর্মের ধারায় চলেছেন। তোমরা তা দিয়ে তৈরী। কর্মই হল তোমাদের ধর্ম। তাই কর্মী কর্মের পথে চল।

আজ সবাইকে এই রঙের সাথে রঙ মিলিয়ে নিতে বলেছি। সেই আকাশের রঙ কৃষ্ণবর্ণ (নীলাকাশ), সূর্যের রঙ সপ্তবর্ণ। সেই সপ্তবর্ণের বর্ণ (রঙ) বর্ণিত হল মূলাধার থেকে সহস্রারে। আর ঐ কৃষ্ণবর্ণ, সেই বর্ণ হ'ল মহাকাশের বর্ণ। ঐ বর্ণ বর্ণতেই রয়েছে। তাকে বর্ণনায় আনা যায় না। তাই ঐ বর্ণকে বর্ণনায় আনা চলে না। কিন্তু বর্ণবোধটা রয়ে গেল। সেই বর্ণবোধ আছে এই ধরাতে ধারাপাতারূপে। ধরায় হ'ল ধারাপাতা। বর্ণে হ'ল বর্ণবোধ। **অ আ-র মধ্যে রয়েছে সেই বর্ণবোধ। সেই বর্ণবোধে আছে অনন্ত বিশ্বের সুরের কথা। সেই সুরে সুর মিলিয়ে যাওয়াই হচ্ছে আমাদের কথা, আমাদের কাজ। রাম নারায়ণ রাম। তাই হে যাত্রিক, হে পথিক, চল গাই মহাশূন্যের মহা পথিকের গান। রাম নারায়ণ রাম। সেই সূরে সুর দিয়ে চল যাই আমরা।**

মহাকাশের বর্ণ দেখতে পাচ্ছ, আবার খুঁজলে এই বর্ণ নাই। আখ্যা আছে কিন্তু আখ্যা ও ব্যাখ্যা নাই। আমরা সেই চলার পথের পথিক। তারই ধ্বনি, তারই মন্ত্র দিচ্ছি, যেই মন্ত্রে গুরু গুরু ধ্বনি আছে, মেঘের গর্জন আছে, বিদ্যুতের চমকানি আছে এবং বর্ষণ আছে। আমরা সেই ধারার মন্ত্র দিচ্ছি, যাহাতে গর্জন আছে, বর্ষণ আছে, আলো আছে। সেই সুরের সাথে সুর মিলিয়ে তোমরা চলছো। দুঃখ লাগছে, যারা চলে গেল, তারা শুনতে পেল না। যাক সে কথা। কথাগুলো তোমরা নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নেবে।

গ্রহণ লেগে গেছে। দেখ, প্রকৃতির নিয়মে চাঁদ আবার সেই ছায়ার মধ্যে এসে পড়েছে। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এই গ্রহণে জন্ম নিয়েছিলেন। আজ প্রায় ৫০০ বছর ধর ধর। ৬/৭ বছর এদিক ওদিক হতে পারে। তাঁরই রক্ত আবার তোমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে। সেই রক্তে তাঁরই মুখে এই কথাই শুনতে পাচ্ছ, আমাদের সবার রক্ত লাল। সবার রক্ত এক রক্ত। সুতরাং সব রক্ত লাল এখানকার। আমরা এক আবীরের রঙে সব বাঁধা, সাধা ও গাঁথা। তাই আমরা সবাই এক জাতিরে। এইখানে অন্য কোন জাতি নাইরে। এক নীতির উপাসনায় আমরা সবাই এগিয়ে যাচ্ছি। তোমরা আস্তে আস্তে করে একটু রাম নারায়ণ রাম গান কর।

শিবের ত্রিশূলের তিনটা মাথা জানতো? — ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না। ত্রিশূল হাতে নিয়ে শিব আজ্ঞাচক্রে (দুই ভ্রূ-র মাঝখানে দ্বিদলে) লিখলেন। কি লিখলেন? রাম নারায়ণ রাম। শিব আবার সহস্রারে লিখলেন রাম নারায়ণ রাম। রাম নারায়ণ রাম। রাম নারায়ণ রাম। শিব সবাইকে জানিয়ে দিলেন রাম নারায়ণ রামের ব্যাখ্যা, প্রকৃতির ব্যাখ্যা। রাম নারায়ণ রাম। বিশুদ্ধ চক্রে (কণ্ঠে) শোধন হয়। শিব বিষ হরণ করলেন। রাম নারায়ণ রাম।

সূর্যের থেকে যে আলোটা আমাদের কাছে আসছে, সরাসরি আসে না। বহু বহু বহু অবস্থার ভিতর দিয়ে আস্তে আস্তে শোধন হতে হতে আমরা এখানে পাচ্ছি পবিত্র আলো। সূর্যের আলো সরাসরি এখানে পেলে কেউ বাঁচতে পারবে না। সর্ব জায়গায় এই আলো filtered হয়ে হয়ে আসছে। তাই এখানে এই দেহবীণাযন্ত্রে রাম নারায়ণ রাম মহানামও filtered হতে হতে আজ্ঞাচক্রে গেল। তারপর সহস্রারে (মস্তিষ্কে) গেল।

তোমরা সব জন্ম সন্ন্যাসী। মনে রেখো, তোমরা কিন্তু সন্ন্যাসী। মৃত্যু যাদের আছে, তারাই হল সত্যিকারের সন্ন্যাসী। আর ঘর ছেড়ে যারা বাহির হইয়া যায়, এটা সন্ন্যাস নয়। ঐটা ভ্রমণ হয়। তাহলে তো মেয়েরা সবাই সন্ন্যাসী। মেয়েরা তো বাপের বাড়ী থেকে শ্বশুর বাড়ী যায়। বিরাট সন্ন্যাসী। পিতৃগৃহে সব কিছু ত্যাগ কইরা (করে) যায় গিয়া। বাবার বাড়ীর যা আছে, সব ত্যাগ কইরা যায়। গেরুয়া পরলাম, ফট্‌কা বাঁধলাম, আর সন্ন্যাসী হয়ে গেলাম? ঐরকম সন্ন্যাসী ঠিক নয়। তোমরাই হচ্ছ সত্যিকারের সন্ন্যাসী।

— বাবা, আমাগো (আমাদের) তো কাম, ক্রোধ, লোভ, মায়া, মোহ কত কিছু আছে। সন্ন্যাসী গো এইসব থাকা কি উচিত?

আমি বলি, হ্যাঁ, সন্ন্যাসীদের ঐগুলি সবই থাকবে। কেন থাকবে? তোমরা আজ পর্যন্ত কত কিছু খেয়েছ, চিন্তা করে দেখতো। আড়াই পয়সা/তিন পয়সা সেরের দুধ কেউ কেউ খেয়েছ। সেই দুধের আজ কত দাম হয়ে গেছে। তিন টাকার চাল ১৫০ টাকা / ২০০ টাকা পর্যন্ত গেছে একসময়।

চিন্তা করে দেখ, কত চাল, ডাল, তেল, লবণ, ঘি, দুধ, মাছ খেয়ে চলেছে সবাই। খেয়ে কি বেঁচে আছে? তোমরা কি বাঁচার দিকে যাচ্ছ? না, ক্রমশঃ ক্রমশঃ শ্মশানের দিকে যাচ্ছ বলতো? খেয়ে যদি বাঁচতেই না পারলে, তাহলে এটা কি খাওয়া? দেখ, তোমাদের অল্পবয়সে যাদের বাবা ছিলেন, আজ অনেকের বাবা নাই। দুঃখ লাগে না? অনেকের মা নাই। কারও স্বামী নাই, কারও ছেলে নাই। কত দুঃখের কথা। তারা সব গেল কোথায়? তা বাঁচলো কোথায়? এত খাওয়া খাওয়ালে, এত কিছু করলে, তবু তো রইলো না। তাই বলছে, জীবনে এই রাস্তাটা ভোগের রাস্তা; ভোগ রোড। G.T. Road, B.T. Road থাকে না। তেমনি ভোগ রোড। এই ভোগের রোডের ভিতর দিয়া দুর্ভোগ পোহাতে পোহাতে সব ব্যাটারা চলছে। তাইলে খাইতে খাইতেই তো যাইতেছি আমরা। খাওয়াটা থাকে কোথায়? এই পেটটা ভরতে পারছো জীবনভর, সকালে ভরো, দুপুরে খাও। আবার দুপুরে ভরো, রাত্রে খাও। হায় হায় রে। এতটুকু একটা পেট খইল্‌তা (থলে), এইটাই আজ পর্যন্ত ভরতে পারলা না। দেখ দেখি, কি কারবার। এতটুকু খইল্‌তা (থলে, পেট) জীবনে সব রোজগার, এইটার (পেটের) মধ্যে ঢাইলা (ঢেলে) দিয়া দিছ। খইল্‌তা (পেট) আর ভরলো না। ভরা আর যায় না। এই ক্ষুধার যা বিষয়বস্তু, আসল ক্ষুধা, অনন্ত ক্ষুধা—এই ক্ষুধার সঙ্গে যুক্ত থাকে সব সময়।

আর এই যে ঘুম ঘুমাইয়া চলছো। দুপুরে ঘুমাও। রাত্রে ৯/১০টায় ঘুমাইয়া (ঘুমিয়ে) আবার ভোরবেলা ওঠো। এই ঘুমাইতে ঘুমাইতে তো চলছো। কোন কাজ হইতাছে তোমাগো (হচ্ছে তোমাদের)? আর নাকও তো কম ডাক না। আরে বাপরে বাপ। এখন যদি অরে (ওকে) বলি, বইসা বইসা (বসে বসে) নাক ডাকতো। নাক দিয়া রক্ত বাইরাইয়া (বেরিয়ে) যাইব গিয়া।

আর এই ব্যক্তি যখন ঘুমাইয়া থাকে, নাক ডাইকা (ডেকে) চলছে দেড় ঘণ্টা/দুই ঘণ্টা। আর (ওকে) জাগাইয়া যদি বলি, নাকে ব্যথা আছে তোর? কোন ব্যথা পাইছোস্ (পেয়েছিস) নাকি?

— আজ্ঞে, না তো।

ঘুমিয়ে যখন আছে, নাক ডেকে চলছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কি চমৎকার ঘুমাইতাছে। আর জেগে বসে বসে দশ মিনিট ঐ রকম শব্দ করলে দেখবে, নাকের মধ্যে কি রকম অবস্থা হয়ে যায়। কিন্তু ঘুমিয়ে থাকলে হয় না।

এই ঘুমটা হইল প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী এক ধরণের বিরাট সমাধি। ঘুমটা এক ধরণের মৃত্যু। রোজই আমরা মরতেছি (মরছি)। হায় হায় রে। আমরা একদিন মরবো, এটা জানো তো? ঘুমের মধ্যে তাকিয়ে রইছে, লোকটা দেখে না। 'কি' দুঃখের কথা। চোরে চুরি কইরা লইয়া (করে নিয়ে) যায়, দেখে না। চোরে বুঝছে, এইটাই এর ঘুম। তাকিয়ে আছে, দেখে না। চোখে তাহলে দেখে না। চিন্তা করে দেখ দেখিনি। এই দেহের মধ্যে কে দেখে, কে শোনে, কে খায়, খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই এই ঘুমন্ত সমাধির কথা তোমাদের আরেকদিন বলবো। ঘুমের সমাধিতে কি কি হয়, প্রকৃতির নিয়মে কেন ঘুম দিল? কি প্রয়োজনে দিল? কোন্ সুরকে দখল করার জন্য? কোন্ বিষয়বস্তুকে অধিকারে আনার জন্য ঘুমের প্রয়োজন? সেটা সময়মতো আরেকদিন বলবো। আজ আর সময় নেই।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

গুরুর আশীর্বাদে তোমাদের অন্তরে জ্ঞানসূর্য্য ফুটে উঠুক

পাম এভিনিউ (কোলকাতা)
১০ই অক্টোবর, ১৯৬৫

১৯৩৫ সাল। সিলভার জুবিলি। রাজা পঞ্চম জর্জের ফটো আমার কাছে নিয়ে গেছিল। ফটোটা আমার হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে গেল। আমি বললাম, 'রাজা আর থাকবে না।' সেই বছরই পঞ্চম জর্জ মারা গেল।

আমি স্কুলে যখন পড়তাম, এক ক্লাসেই দুই বছর করে থাকতাম। কারণ মাষ্টারমশাইরা আমাকে ছাড়তে চাইতেন না। কান্নাকাটি করতেন। আমিও থাইকা (থেকে) যাইতাম। আমার লগে (সঙ্গে) যারা পড়তো, দেখি, তারাই আমার মাষ্টারী করে। থ্রিতে গেল দুই বছর, ফোরে গেল দুই বছর। এতে চার বছর চলে গেল তো। সহপাঠীরা অনেকেই চলে গেল। এক বই দিয়েই দুই বছর চালাতাম। বাবা বলেন, 'তোমার বই কিনতে হবে না? তুমি বই পেলে কোথায়?' আমি বলি, 'না না। আমি এক বই দিয়েই চালাচ্ছি।'

যোগেশ চৌধুরী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর কাছে যাতায়াত করতো। আর এর (খগেন চ্যাটার্জী) বাবা অশ্বিনী চ্যাটার্জীও লোকনাথ ব্রহ্মচারীর কাছে যেত। মহেন্দ্রবাবু আমাদের স্কুলের হেডমাষ্টার, এদের সমসাময়িক ছিলেন। শতকরা যখন পাঁচ ছয় জন পাশ করে তিনি সেই সময়ে পাশ করেছিলেন। মহেন্দ্রবাবু ছিলেন খুব জ্ঞানী। অন্যান্য মাষ্টার না থাকলে হেডমাষ্টার মাঝে মাঝে আমাদের ক্লাসে যেতেন, পড়াতেন। পড়াটড়া জিজ্ঞাসা করতেন আমাকে, 'ছোট গোঁসাই, তুমি বল।' পড়া হতে অন্য বিষয়ই বেশী জিজ্ঞাসা করতেন।

মহেন্দ্রবাবুকে বহুলোক ধরতো, 'এই যে চারদিকে রোদে পুড়ে যাচ্ছে, বৃষ্টি হচ্ছে না, আপনার স্কুলে যে ছাত্র আছে, 'বাচ্চা গোঁসাই', তাঁকে বলেন বৃষ্টি নামিয়ে দিতে।' চারিদিক থেকে লোক এসে মাষ্টার মশাইকে বিরক্ত করতো।

মাষ্টার মশাই একদিন এসে আমাকে বললেন, বৃষ্টি না হওয়ার কথা। আমি বলি, 'আচ্ছা, জল নিয়ে আসুন।' বৃদ্ধ মানুষ, নিজেই ছুটছে জল আনতে।

আমি জল ছিটালাম। ঘরের মধ্যে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

মাষ্টার মশাই বলেন, 'বাইরে তো হচ্ছে না।' পরে বাইরে একদিকে রোদ, আর একদিকে এত বৃষ্টি হল যে, সেদিককার মাঠঘাট জলে ভেসে গেল। পরের দিন মাষ্টার মশাইয়ের বাড়ীতে লোকের পর লোক, ক্ষিরাই, বাঙ্গীতে তাঁর ঘর ভরে গেছে।

অনেকে আবার বাচ্চা গোঁসাইর কাছে মানস করতো, 'গোঁসাই, ক্ষিরাই, বাঙ্গী যেন না খায় শিয়ালে।' আর খেত না।

১৯৩৩/৩৪ সনে স্কুলে ইনস্পেক্টর এল। ইনস্পেক্টর আসা মানে গভর্ণর আসার মত তখনকার দিনে। স্কুলের সেক্রেটারী হেডমাষ্টারকে বলছেন, 'আপনি যা চান, তাই দেব। নদীর বড় বড় মাছ, আর যা বলবেন। স্কুলের সুনাম যেন রক্ষা হয়।' হেডমাষ্টার তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করলেন।

ইনস্পেক্টর এলেন, কামারুদ্দিন সাহেব। আমাদের ক্লাসে নিয়ে গিয়ে আমায় চিনিয়ে দিয়েছে। আমাকে পড়তে বলেছে। আমি বেঞ্চির উপর দাঁড়াচ্ছি। আমাকে বলেন, 'না না, তোমায় দাঁড়াতে হবে না।' বইপড়া আমার আর হয় না। এত লোকের ভিড় থাকে যে, বই আর পড়া হয় না। কোনরকমে 'রামের সুমতি', না কি গল্প ছিল পড়লাম। ইনস্পেক্টর বললেন, পরে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

পরে আমাকে ডাকা হলো। ইনস্পেক্টর বললেন, 'আমার পরিবারের অসুখ কিভাবে সারবে?' আমি বলি, 'সেরে যাবে, বাড়ী যেতে যেতে।' ইনস্পেক্টর বলেন মহেন্দ্রবাবুকে, 'আপনার ছাত্রটি তো বেশ।'

— হ্যাঁ, এর জন্যই স্কুলটি চলছে।

অনেকে আবার দেশের কথা জিজ্ঞাসা করতো, 'আমাদের দেশ কি করে স্বাধীন হবে?'

— নিজেরা সমাধান না করলে হবে না।

— সমাধান কি করে হবে?

— সমাধান করা যায় ইংরেজদের তাড়ালে। ইংরেজদের না তাড়ালে দেশের সমস্যার সমাধান হবে না। আমাদের মনের ঠিক নাই।

আনন্দমাষ্টার বলেন, 'দৈবশক্তি দ্বারা দেশকে সুন্দরভাবে তৈরী করা যায়। তোমার দৈবশক্তি দিয়ে কর।'

আমি বললাম, দৈবশক্তি দিল তৈরী করার জন্য, মন তৈরী করার জন্য। ৬০/৭০/৮০ বছরের সুখের জন্য দৈবশক্তি প্রয়োগ করে কি হবে? এক শত্তুরের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করায় লাভ কি? দৈবশক্তির কাজ ভিতরে ভিতরে হয়। এই যে বৃষ্টি হল, আমি কি ঘরে চিৎকার করেছিলাম?

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা, মরে গেলে কোথায় যাব? তোমাকে দেখতে পাব?

উত্তর ঃ আপনি দেখতে পাবেন কি না জানি না। আমি দেখতে পাব।

প্রশ্ন ঃ আমার (আনন্দ মাষ্টার) আবার জন্ম হবে কি না?

উত্তর ঃ যখন এসেছেন, জন্ম হলেও হতে পারে। ছিলেন যে, তাতো বুঝতে পারছেন। পোলাপানের কথা তো।

শুক্রবার জুম্মাবার। আমায় নিয়ে যেতো মৌলভী সাহেব। হাতটা ধরে বলতো, দেখতো ঠিক কাজ করছি কি না?

আমি — হ্যাঁ কাজটা ঠিক হচ্ছে। তবে কথা হল, নম্বর ঠিকমত দিবেন কি না। নম্বর ঠিকঠাক দিবেন। আমি হাত দেখে সব বলে দেব।

মৌলভী সাহেব — আচ্ছা, এতো তোমার কথা নয়। কেউ শিখিয়ে দিয়েছে বুঝি?

আমি — কেন? আমি কি স্কুলে পড়ি নাই?

মৌলভী সাহেব — আচ্ছা, নম্বর দেব।

আমি — আপনার বউ এবছরে মারা যাবে। আর একটা বিয়া (বিবাহ) হবে। আর কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারবেন না।

প্রশ্ন — এর উপায়?

উত্তর — এর উপায় হবে কিছুদিন পর।

মৌলভী সাহেব কাজ টাজ আর করে না। চুপচাপ মনমরা হয়ে থাকে। হেডমাষ্টার আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, ''কিহে কি বলছে? একটা বস্তু টস্তু দেওয়া যায়?''

আমি — ইটের চাকা খেতে পারবে?

প্রশ্ন — ইটের চাকা কি খাওয়া যায়?

উত্তর — যেমন অসুখ, তার সেরূপ ঔষধ।

মৌলভী সাহেব ইট চাটতে চাটতে বলেন, ''মিষ্টির স্বাদ পাচ্ছি। এখন কি হবে?''

আমি — এ বছরের মত রয়ে গেল।

প্রশ্ন — তারপর?

আমি — আরও দু'বছর ঠিক থাকবে।

প্রশ্ন — পরে কি হবে? আবার চাকা চিবাইতে হবে নাকি?

আমি — দেখি, একটা পাথর-টাথর দেওয়া যায় কিনা।

তিনবছর পর পাথর নিয়া মৌলভী সাহেব আমার পিছনে পিছনে ঘুরছে। আমি কোথায় গেছি; আমারে পায় নাই। বাবার কাছেও ছুটছে। পরে বউটা মারা গেছে।

স্বদেশীর সময় আমারে চরকা কাটতে দিয়েছে। আমি বলি, আর কাজ নাই। এইটা দিয়া ষ্টীমার বানাই। চরকা না শিখে, নৌকা বাওন (বাইতে) শিখুক। নৌকা বাওন, শিখলে বেশী কাজ হবে। নৌকা বেয়ে বিদেশী সওদাগরেরা ব্যবসা করতে এসে দেশ দখল করে নিল। আমি নৌকা বাইছি চরকা দিয়ে। আমি চরকা কাটবো না। সময় নষ্ট ''ই'' নষ্ট। আমি চরকা না কাটলে গ্রামে আর কেউ চরকা কাটে না। এরজন্য গ্রামের দারোগা, পুলিশ ১৯৩২/৩৩ সন পর্যন্ত ধাওয়া করছে। তখন থেকে আমার পিছনে লাগছে।

আমার এক শিষ্য ডাকাত। 'ও' চুরি করছে আর আমার কাছে পুলিশ আসছে। 'ও' চুরি করছে তো আমার কাছে আইছে কেন? হাইড়া (শিষ্য) ১২ বাঁধ (এক একটা বাঁধে ১২ খানা করে টিন থাকে) টিন চুরি করেছে। আমি তাকে ডাকালাম — 'হাইড়া কি করেছিস? যা, টিন ফেরত দিয়ে আয়।'

সে (হাইড়া) ১১ বাঁধ টিন ফেরত দিয়ে এল। এক বাঁধ দিল না। সব দিয়ে দিলে খাবে কি? 'ও' যখন ডাকাতি করতো, দীক্ষা নিয়েছিল আমার কাছে। ডাকাতির পয়সা দেবে না আমাকে। একদিন খেটে, সেই উপার্জনটা আমাকে দেবে। পরে সে ডাকাতি ছেড়ে দিয়েছিল।

গ্রামে গঞ্জে নমঃশূদ্রদের অস্পৃশ্য বলা হ'ত। তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহারও করা হ'ত না। একবার কি একটা পরবে (পার্বণে) পাড়ার মধ্যে দু'টো ক্লাস (শ্রেণী) হয়ে গেল। গ্রামের হাজার হাজার নমঃশূদ্র এক হয়ে গেছে। এর মধ্যে

হাইড়াও আছে। ওরা (নমঃশূদ্ররা) ঠিক করেছে, বাবু বলে কাউকে মানবে না।

গ্রামের বাবুরা এসে আমায় ধরেছে। এর মধ্যে তো হাইড়া ব্যাটা আছে। সে সাংঘাতিক লোক। তার গুলালের নজর খুব। গ্রামে হৈ হল্লা পড়ে গেছে। আমি হাইড়াকে ডাকাইছি, খবর দিয়েছি। 'ও' রেগে গেছে। বলে, হের (তার) দরকার থাকলে হেই (সেই) আসবে।

গেলাম সেখানে। আমাকে দেখে একটা চৌকি পেতে দিয়েছে। ওটাই ওর (হাইড়ার) পক্ষে সবচেয়ে বড় সম্মান দেওয়া। আর সব বাবুকে বলে মাটিতে বসতে। ভয়ে ভয়ে তারা (বাবুরা) তাই করলো। নমঃশূদ্ররা বলছে, 'আমরা এখন বাবু হবো। এখন আর যামিনীবাবু, কামিনী বাবু ওসব চলবে না। আমরা ওদের মেয়েদের বিয়ে করবো।' প্রায় ৭০০ জন একত্র হয়ে লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে।

আমি চৌকির উপর দাঁড়িয়ে বললাম, ''এরা (নমঃশূদ্ররা) যে দাঁড়িয়ে নিজেদের দুটো কথা বলতে পেরেছে, এতে আমি আনন্দ পেলাম। **আজ সত্যিকারের আসনের অধিকার নিয়ে এরা এগিয়ে এসেছে। এদের সঙ্গে যদি আমরা যোগাযোগ রাখতাম, এদের কাজের মর্যাদা দিতাম, তাহলে এরূপ হতো না। সেই সুযোগ ওদের এখন দেওয়া দরকার।** এরা যে আগে বললো, চাল ডাল সব লুট করে নেবে, এরা (নমঃশূদ্ররা) এটা করবে কেন? তারা রোজগার করেই খাবে।''

বাবা এলেন। তাঁকে আসন ছেড়ে দিলাম। ওরা বলছে, ''সুরেনবাবু আইছেন (এসেছেন)। আপনি কিছু বলেন।''

বাবা বললেন, ''পোলা (ছেলে) বলছে। তাতেই হবে। আমার কিছু বলার নাই।''

আমি বললাম, ''আজ থেকে তোমাদের কেউ অপমান করে, নাকি চেয়ার দেয়, দেখ। তারপর বলবে। বাইরের বিড়াল ঘরে আসতে পারে, আর তোমরা বসার জায়গা পাবে না, তা কি করে হয়? এরপর আর যেন এরকম কিছু না হয়।'' আমার কথায় খুশী হয়ে তারপর সবাই হাত নামালো। প্রায় ১৫০০/২০০০ জন একত্রে বসে হরিনাম করলো। খিচুড়ি রান্না হলো। একসঙ্গে বসে খিচুড়ি খাওয়া হলো। আমি হরিজন; এদের সঙ্গে বসে খেলাম। জাতিগত বৈষম্য রইলো না।

তারপর ১৯৪০/৪১ সালে লাগলো রায়ট। পাকিস্তানে সব হিন্দুদের আক্রমণ করবে। প্রায় দুই লক্ষ মুসলমান একত্র হয়েছে, ১০ হাজার হিন্দুকে শেষ করার জন্য। ছোট দ্বীপের মত গ্রাম। আশেপাশের গ্রামে আগুণ লাগিয়ে দিয়েছে। আমি ভাবছি, 'কি করা যায়?' দুপুর দুইটা, তিনটার সময় লোক এসে হাজির, ''সুরেনবাবু আছেন? আপনার পোলাপান (ছেলেমেয়ে) নিয়ে আসুন;'' প্রেসিডেন্টের (মুসলিম) হুকুম।

প্রেসিডেন্টের ছেলে আমার ক্লাস মেট (সহপাঠী)। সে বাবাকে খুব ভালবাসে। সেই হিসাবে তার বাবাও (প্রেসিডেন্ট) আমাকে খুব ভালবাসে। বোঝ, এই খবর পেয়ে গ্রামে কি অবস্থা। প্রেসিডেন্ট দুই লক্ষ মুসলমান ঠিক করেছে। আমি শুনলাম সব। কবে হবে?

— আজ, কাল, পরশু তিনদিন এই ঘটনা ঘটবে।

সবাই আমাকে ধরেছে, কিছু করা যায় কিনা। বাঞ্ছারামপুর গ্রামে সেই প্রেসিডেন্ট থাকে। আমি গিয়ে তাঁকে ধরেছি। আমাকে দেখেই, কপটরাগে বলছেন, ''তুমি এসেছ ক্যান্? ত্রৈলোক্য পাঠিয়ে দিয়েছে বুঝি? তুমি ভিতরে যাও।''

ওঁরা নবাব ফ্যামিলির লোক। ওঁর মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে টিয়ের বন্দোবস্ত করেছে। মেয়ে নাম হেনা, হাস্নুহানা বেগম, অপরূপ সুন্দরী। মেয়েকে বলি, ''তুমি তো আমাকে ভালবাসো। তোমার বাবাকে বলো, এইসব বন্ধ করতে।'' মেয়ে বলে, ''বাবা, আমার চেয়ে তোমাকেই বেশী ভালবাসে। তুমিই বলো।''

ওঁর ছেলের নাম মান্না, আমার ক্লাসমেট। তাকেও ধরলাম। তারপর তিনজন মিলে ধরলাম প্রেসিডেন্টকে। আমি আদর করে তাঁর দাড়ি ধরে বললাম, ''তুমি এসব কিছু করতে পারবে না।''

প্রেসিডেন্ট বললেন, ''যে ভয়টা করেছিলাম, তাই হল। ত্রৈলোক্য এই বোরের চাল দিয়েছে। এর জন্যই আমি ১০/১২ দিন আগে সুরেনবাবুর ফ্যামিলিকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম।'' তারপর সব শান্ত হয়ে গেল। মারামারি কিছুই হলো না।

এরপর নবাব বাড়ির সাথে সম্পর্ক আরও গভীর হল। হেনার সাথে বিয়ের সম্বন্ধ হল। চিঠির যোগাযোগ হতে লাগলো। মান্নাকে দিয়ে আমাকে চিঠি দেয়। হেনা প্রেমের চিঠি লিখেছে। আমি লিখেছি, 'ভালবাস, ভালবাস, তাই থাক'

ইত্যাদি। সেই চিঠি দেখি, বাঁধিয়ে রেখেছে। পরে বলি, যেদিন আমি ঠিক করবো যে বিয়ে করবো, সেদিন জানাবো। মান্না বলছে, 'সেটাই ঠিক হবে।' সে (হেনা) আজও বিয়ে করেনি। তার চিঠির উত্তরে আমি তাকে লিখেছি, ''জীবনে চলতে গেলে অনেক বাধা আসে। **এই যে বিয়ে শাদি সবাই করছে; ছেলের পর ছেলে আসছে। তুমি যদি আমাকে সত্যিকারের ভালবাসো, আমার কাজের পথে সাহায্য করবে। তার ভিতর অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস সৃষ্টি হবে। আরও মধুময় জীবন হবে। আর প্রাত্যহিক জীবনে হাট কর, বাজার কর, এটা নতুন কিছু নয়। তুমি প্রেম করে এমন কিছু নিতে চেষ্টা কর, যেটাকে সূত্র করে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া যায়।** আরও অপরূপে যাওয়া যায়। এই রূপের মধ্য দিয়ে অপরূপে চলে যাওয়া যায়। **আমি ক্ষুদ্রের মধ্যে নয়। আমার চিন্তা সূর্যের চেয়ে অনেক বড়। অনেক বৃহৎ আকারে যে মন ঘুরছে, তখন তা খুঁজে পাবে। সূর্য এতটুকু থালার মত দেখায়। কিন্তু সে বিরাট। আমার মন ক্ষুদ্র মনে হলেও তা বৃহৎ। আমি ক্ষুদ্র বস্তুর মধ্যে থাকবো না। আমি বিরাট থেকে এসেছি।** আমি আদি থেকেই এসেছি। নতুন করে আর কি বলবো। তোমার ভাই মান্না ক্লাস থ্রি হতে আমাকে চিনেছে। আমার ছোট বয়সের বন্ধু। সে আমার মধ্যে অনেক কিছু দেখেছে। তার বই চুরি হয়েছে। বের করে দিয়েছি। যে চুরি করেছে, সে উঠতে পারছে না।

মান্নার বই চুরি হয়ে গেছে। ক্লাসশুদ্ধ সবাই সবাইকে সন্দেহ করছে। মাষ্টারমশাই ক্লাসে এলে তিনি বিষয়টি অবগত হন। তখন মাষ্টারমশাই আমাকে বলেন, ''বইটি কে নিয়েছে, তুমি বলে দাও।''

আমি মাষ্টার মশাইকে বলি, ''আপনি সবাইকে দাঁড়াতে বলবেন, আমি যখন বলবো, তখন। যে বইটি চুরি করেছে, সে বেঞ্চ থেকে উঠতে পারবে না''। এরপর মাষ্টার মশাইকে বলি, ''এবার বলেন মাষ্টার মশাই।''

মাষ্টারমশাই সবাইকে উঠে দাঁড়াতে বললেন। ক্লাসশুদ্ধ সবাই উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু যে বইটি চুরি করেছে, সে আর উঠতে পারলো না।

আমার যে জন্মগত স্ফূরণ; তাই আমার চিন্তাধারা অনেকদূর চলে গেছে। আমি এই বিশ্বরূপের ভিতর দিয়ে নিজের রূপের পরিচয় দিতে চাই। তুমি আমাকে পরমস্বামী হিসাবে চিন্তা কর। সেখানে অনন্ত রূপের শয্যায় আমাকে আলিঙ্গন কর। সেই চিন্তার মাধ্যমে এমন সাড়া পাবে যে, সেখানে পরম শান্তির

সন্ধান পাবে। সেখানে যে গর্ভ হয়, তাতে সুন্দর সুন্দর শিশু সাড়া দিয়ে যায়। সেসব হচ্ছে জ্ঞানশিশু। আমাকে যদি সত্যিকারের ভালবাস, তবে আকাশের মত মনকে বৃহৎ কর। ক্রমশঃ ক্রমশঃ তোমার মনকে আকাশে ছেড়ে দাও।

আমার প্রেম হয়ে গেল। তার বাবা এই চিঠি পড়েছে ও কইছে, ''হেনা, তুমি ওঁর সাধনা কর। 'ও' তোমাকে গণ্ডীর মধ্যে রাখতে চায় না। বৃহতে ছেড়ে দিতে চায়। সেটাই হবে তোমার সত্যিকারের সাধনা।

হেডমাষ্টার মহেন্দ্রবাবু — বাবা, কি হ'ল? কতদূর এগোল?

আমি — না, নিমন্ত্রণ খাওয়া হ'ল না মাষ্টার মশাই। ১২ পৃষ্ঠা চিঠি লিখেছি। বুড়া আবার সেই চিঠি দেখে এসেছে।

আজ পূর্ণিমার দিন। আজকে পূর্ণচন্দ্র বিরাজ করবে। সেই পূর্ণচন্দ্রের আলোক, জ্ঞানসূর্যের আলোক তোমাদের ভিতর জেগে উঠুক। অনেক কণিকা মিলেই আলোর সৃষ্টি হয়। সেই আলো, সেই তেজ, চন্দ্রের স্নিগ্ধ আলোতে তোমরা আলোকিত হও। বালুকণার উপর, বরফের উপর, তেজঃ কণিকার ভিতর যেমন সূর্যরশ্মি প্রতিবিম্বিত হয়, আমাদের ভিতরেও জ্ঞানসূর্য তেমনিভাবেই আলোকিত হয়ে উঠুক। সবার ভিতরে ফুটে উঠুক পূর্ণচন্দ্র, ফুটে উঠুক জ্ঞানসূর্য, ফুটে উঠুক সেই সুর। লক্ষ্মী মানে শ্রী। তাই লক্ষ্মীপূর্ণিমাতে তাঁর পূজা করা হয়। ধনে জনে শ্রীবৃদ্ধি তখনই হয়, যখন ষোলকলা পূর্ণ হয়, পূর্ণচন্দ্র উদ্ভাসিত হয়। আমাদের ভিতরেও যেন শ্রী দিনে দিনে বৃদ্ধি হয়। আমরা সুরের পূজারী। আমরা জ্ঞানের পূজারী। আমরা শ্রীর পূজারী। আজকে পূর্ণিমার দিন। তোমাদের উপরে সেই আশীর্বাদ রইল। গুরু হচ্ছেন শ্রী। **গুরুর আশীর্বাদে তোমাদের অন্তরে জ্ঞানসূর্য ফুটে উঠুক। চাঁদ জোড়হাত করে থাকে সূর্যের কাছে। তোমরা গুরুগত প্রাণ হয়ে যাও। সেই যে একরকম সর্প আছে, যখনই সূর্য ওঠে, তার ফণা এরকম (বিস্তার) করে সূর্যমুখী হয়ে থাকে। তোমাদের ফণাটা যেন গুরুমুখী হয়। আজ থাক।**

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

-ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ-

১) কৃষ্ণা S.T.D. বুথ, বি-২ বাজার, M.A.M.C. দুর্গাপুর - ১০
ফোন - ০৩৪৩-৫৫৬০১২৯
২) রাম নারায়ণ রাম ভবন, রেখা মিত্র, ৪৭ নতুন পল্লী, বর্ধমান
৩) জয়ন্ত দে, আহেরী টোলা ষ্ট্রীট, কোলকাতা-৫, ফোন - ২৫৩০-৪৮০৭
৪) সৌরীন্দ্র নাথ বাগচি, দক্ষিণেশ্বর, কোলকাতা - ৭৬, ফোন - ২৫৬৪-২৪৪১
৫) বিনয় মোদক, মধ্যমগ্রাম, কোল - ১৩০, ফোন - ২৫৩৭-১৫৯৩
৬) গৌর মুখার্জী, ১১/৫, পর্ণশ্রী পল্লী (পার্ক) বেহালা, কোল - ৩৪
ফোন - ২৪৪৫-৯২২০
৭) কোলকাতা বইমেলা।
৮) অনির্বাণ - মা সারদা কমপ্লেক্স, রাজপুর, সোনারপুর, ফোন-২৪৭৭-৬৫৬৬
৯) তরুন/ইরা জোয়ারদার, বাবুপাড়া, জলপাইগুড়ি, ০৩৫৬১-২২৪৫১৯
১০) রমা নাথ মহন্ত, বালুরঘাট, দঃ দিনাজপুর, মোঃ- ৯৪৭৪৪৩৫০৭২
১১) বলরাম, ৩৪ এস. কে. দেব রোড, কোল - ৭০০০৪৮
১২) Lakshindhar Das, Dularpar, P.O.- Makhanpur
Dist.- Balasor, Orrisa, Phone : 92387-10622
১৩) বেদপ্রজ্ঞা মহিলা সংগঠন লেকটাউন, কোলকাতা, ফোন - ২৫৩৪-৬১৩৬
১৪) সুভাষ ঘোষ বিলাসীপাড়া, আসাম, ফোন ঃ- ০৩৬৬৭-২৫১১৭৯
১৫) দেবু (নেতাজী দেবু) গড়িয়া, কোলকাতা - ৭০০০৮৪
১৬) বাপি অধিকারী — কোটাল হাট বর্ধমান, ফোন ঃ- ৯২৩২৬৮৪২৫৯
১৭) উত্তম চ্যাটার্জী — নিয়ামতপুর, সীতারামপুর, ওয়েস্ট এন্ড, জি.টি.রোড,
আসানসোল, ফোন ঃ- ০৩৪১-২৫১৫০৬৬
১৮) আইডিয়াল বুক হাউস, কলেজ স্কোয়ার, কোলকাতা - ৭০০০০৯

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

অভিনব দর্শন প্রকাশনের প্রকাশিত পুস্তক সমূহ

পুস্তক পরিচিতি	*প্রকাশকাল*
১) বালক ব্রহ্মচারী ট্রাষ্টের নিবেদন	শুভ মহালয়া, ১৪১১
২) মৃত্যুর পর	শুভ মহালয়া, ১৪১১
৩) পরপারের কান্ডারী	শুভ বড়দিন, ১৪১১
৪) সাম্যের প্রতীক শিবশম্ভু	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১১
৫) অঙ্গীকার	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১২
৬) ১৬ মাত্রায় নির্বিকল্প সমাধি	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১২
৭) বীজ ও মহাসৃষ্টি	শুভ মহালয়া, ১৪১২
৮) শুভ উৎসব	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১২
৯) তত্ত্বসিন্ধু	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১২
১০) দেহী বিদেহী	শুভ নববর্ষ, ১৪১৩
১১) পথপ্রদর্শক	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১৩
১২) অমৃতের স্বাদ	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
১৩) বৈদিক বিপ্লব	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৩
১৪) সুরের সাগরে	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৪
১৫) পথের পাথেয়	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৪
১৬) জন্ম মৃত্যু রহস্য	শুভ মহালয়া, ১৪১৪
১৭) মহাশূন্য মহাচেতনার সাগর	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪
১৮) আলোর বার্তা	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৪

বেদপ্রজ্ঞা কমিউনিকেসন্ এর নিবেদন ঃ-

১) পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 1) শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
১) পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 2) শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪